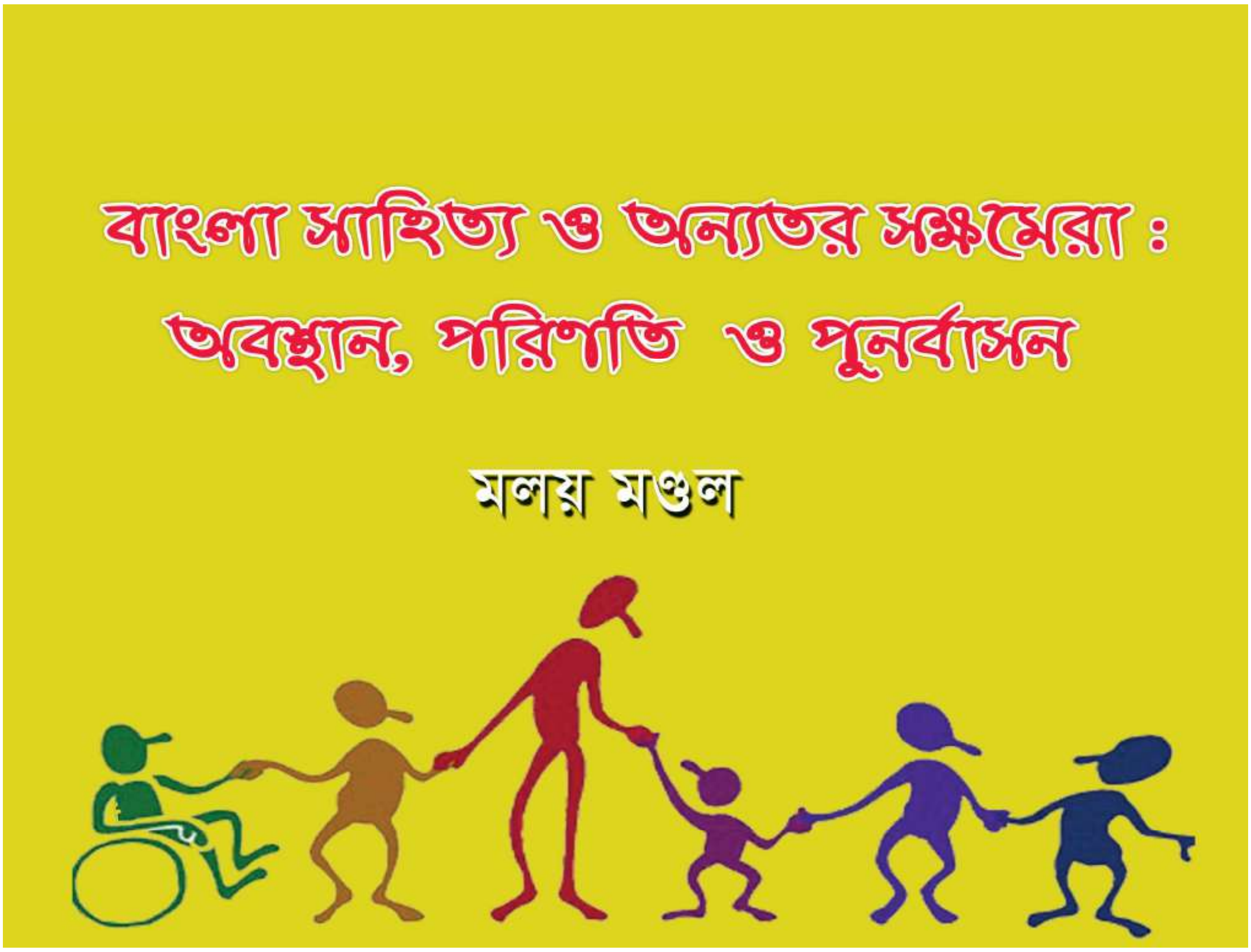

বাংলা সাহিত্য ও অন্যতর সক্ষমেরা : অবস্থান,পরিণতি ও পুনর্বাসন

(Differently Able and Bengali Literature: Situation, Consequence and Rehabilitation)

Principal Investigator
Moloy Mandal
Department of Bengali
Raidighi College

If such a thing as a psycho-analysis of today's prototypical culture were possible . . . such an investigation would needs show the sickness proper to the time to consist precisely in normality.

—Theodore Adorno,

Minima Moralia

ভূমিকা

'আমকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে
যে মুখ অন্ধকারের মতো শীতল , চোখ দুটি রিক্ত হৃদয়ের মতো কৃপণ
করুণ , তাকে তোর মায়ের হাতে ছুঁয়ে ফিরিয়ে নিতে বলি ।
...আমাকে তুই আনলি কেন ফিরিয়ে নে !'

(জরাসন্ধ /শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

এ কাতরোক্তি জীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ রিক্ত কোন মানুষের । যে হয়তো স্বাভাবিক জীবনে পারঙ্গম নয় । হতে পারে সে শারীরিক কিংবা মানসিকভাবে অন্যতর সক্ষম । কেউ তাদের প্রতিবন্ধী মনে করেন, কেউ ব্যতিক্রমধর্মী, কেউবা ভাবেন তারা শারীরিক বা মানসিকভাবে অনুপযুক্ত । ২০১১ সেনসাসের ভিত্তিতে ভারতের মোট জনসংখ্যার ২.২১ শতাংশ মানুষ অন্যতর সক্ষম। ভারতের ২০১১ সালের করা সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিস্পর্ধী মানুষের বিচিত্রতা অনুসারে এইভাবে ভাগ করা হয়েছে—

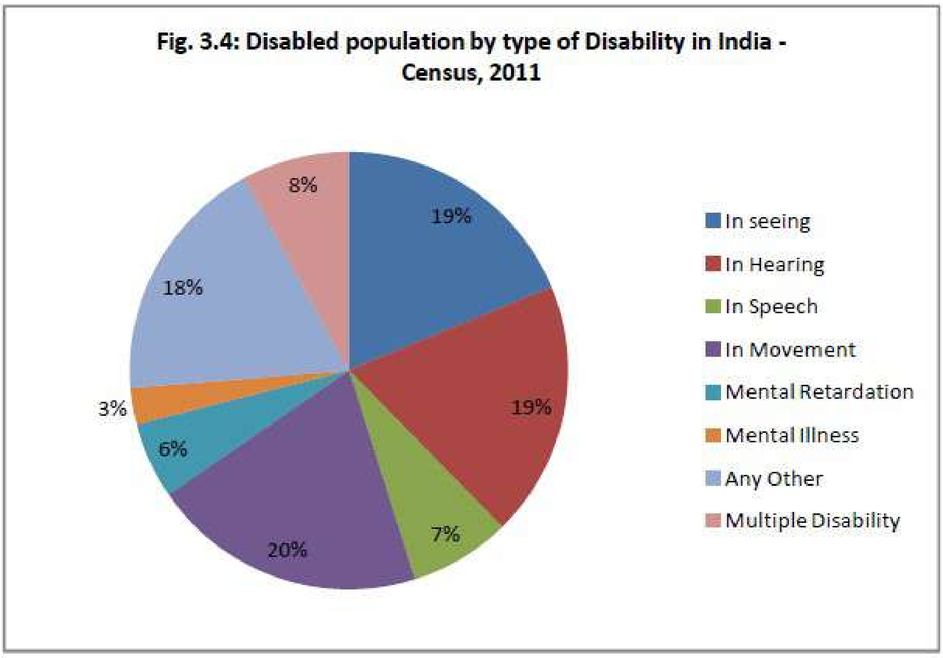

শুধু তাই নয়, নারী পুরুষ, গ্রাম শহর, কিংবা বয়স অনুযায়ী প্রতিস্পর্ধী মানুষকে নিম্নরেখিত গ্রাফচিত্রে দেখানো যায়—

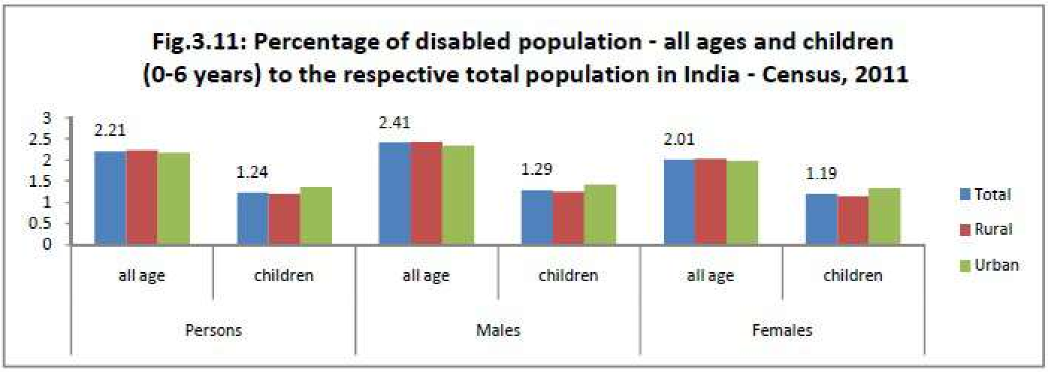

বিভিন্ন কারণে এই সব মানুষের শিক্ষা বা পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকলে অধিকাংশ মানুষ তা থেকে বঞ্চিত হন। উক্ত সেনসাস রিপোর্টে প্রতিস্পর্ধী মানুষদের যে শিক্ষাচিত্রটি প্রকাশ পেয়েছে তা আশাপ্রদ নয়। চিত্রটি নিম্নরূপ—

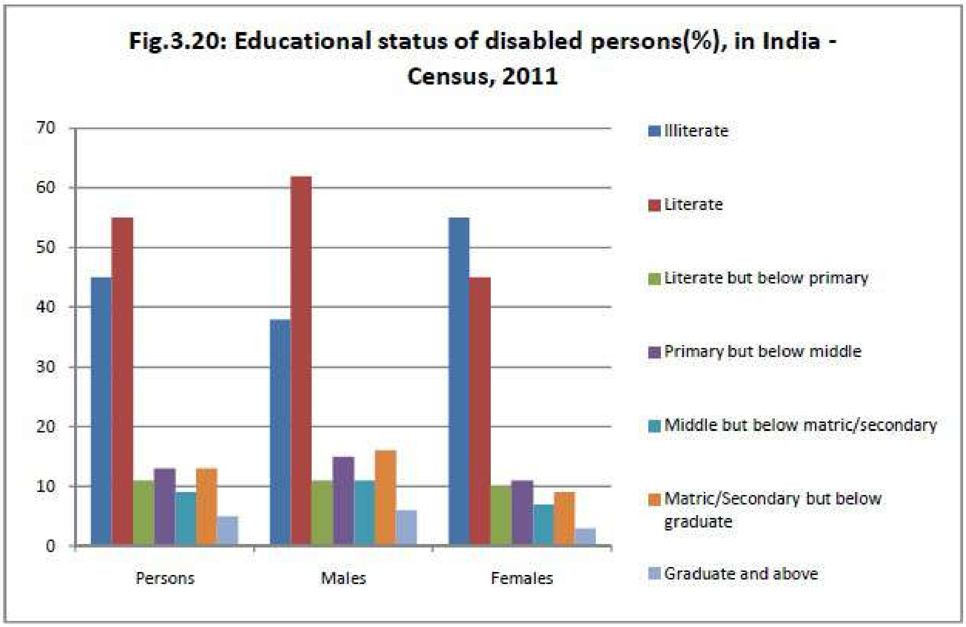

এতো গেল সরকারি হিসেব। বাস্তবতা সবসময় সরকারি রিপোর্টে প্রকাশিত হয় না। বা প্রতিবন্ধী মানুষদের সমাজ থেকে আড়াল করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। ফলে সরকারি সুযোগ সুবিধা বা সিধান্ত

নিতে অসুবিধা হয়। সাহিত্য সমাজ দর্পণ। অন্যতর সক্ষম মানুষদের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠবে সাহিত্যের পাতায়।

সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় ও মানবচরিত্র হলেও তারা তো সুস্থ সক্ষম মানুষ হবে এটাই স্বাভাবিক । কিন্তু বাস্তবতার নীতি মেনে যখন অক্ষম মানুষকেও সাহিত্যে ঠাঁই দিতে হয়, তখন ইতিহাসের নিরিখে সেই চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও পরিণতিটাও বিচার্য বিষয় হয়ে ওঠে । ইউরো-আমেরিকান সাহিত্য থেকে ভারতীয় সাহিত্য সব ক্ষেত্রেই তার ভুরি ভুরি নিদর্শন । ভিক্টর হুগো-র বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঞ্চবাঙ্ক অফ নতরদামস'-এ রয়েছে এক কুঁজো কালা চরিত্র যে গির্জায় ঘণ্টা বাজায়, ঘটনাচক্রে তাকে উপন্যাসের শেষে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় । কিংবা ভারতীয় লেখিকা প্রমীলা বালাসুন্দরমের ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'Sunny Story' উপন্যাসে দেখানো হয়েছে দিল্লীর এক গরীব বাবা মায়ের সন্তান 'সানি'কে , যে আসলে মানসিকভাবে অক্ষম। তার ও তার পিতামাতার বেঁচে থাকার লড়াই এই কাহিনির উপজীব্য ।

২০০৬ সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নিউ ইয়র্ক থেকে লেনার্ড জে দাভিস এর সম্পাদনায় – 'The Disability Studies Reader ' এই গ্রন্থে শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা এবং ইংরাজি ভাষার সাহিত্যে তার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা দেখা যায় । বাংলা ভাষায় এই জাতীয় আলোচনা বা গবেষণা কখনো হয়নি । মূলত চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হয়ত অক্ষমতার বিষয়টি কিছু ক্ষেত্রে বলা হয়েছে । কিন্তু পূর্ণ গবেষণা প্রচেষ্টা এই প্রথম ।

অক্ষমতা সাধারণত যে বিষয়ে দেখা যায় সেগুলি হল দৃষ্টি, শ্রবণ, কথন, চলন, বিকাশ, শিখন প্রভৃতি । এই বিভিন্ন ধরণের অক্ষমতা প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক বাংলা সাহিত্য পর্যন্ত বিদ্যমান । কবিতার ক্ষেত্রে সেটা প্রতীকায়িত , যেমন—

ক. "জেতই বোলবি তেতবি টাল

গুরু বোব সে সীস কাল।" (৪০ সংখ্যা চর্যা , কাহ্নপাদ)

খ. "অন্ধ আমি । - অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে

চিরদিন..." (গান্ধারীর আবেদন-কাহিনি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ. "ছোবল নিয়ে সে ঢুকেছে গহনে গহনে

অন্ধকে ছুঁয়ে বসে আছে অন্ধরা।"

(অন্ধ – প্রহর জোড়া ত্রিতাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

কবিতার প্রতীক জগতের বাইরে যদি দেখি দেখব অক্ষমতা কবিতার মত পেলব নয় । গল্প, উপন্যাস, নাটকের রূঢ় জগতে তাকে বাস্তবকে ছুঁয়ে থাকতে হয় । বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রজনী উপন্যাসে এক অন্ধ নারীর মনের অবস্থাকে এই ভাবে জানান – "পুরুষই হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য , কি সৌভাগ্য যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে।" এই রজনী অষ্টম পরিচ্ছেদে বলেছে – আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হিলাম,...এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে,আমি সর্বাপেক্ষা দুঃখী কেন?...কন পাপে আমি জন্মান্ধ?" রজনীর এই কথাগুলি পূর্ব উল্লিখিত 'জরাসন্ধ' কবিতার সঙ্গে মেলে। রজনীর পুনর্বাসন ও পরিণতি মধুর হয়েছিল ।কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুভা গল্পের সুভাষিণী চরিত্রের পরিণতি এত আশাপ্রদ ছিলনা।রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – "সে কথা কয়না সে যে অনুভব করে ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ ক্রিত।সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লিয়াছিল।তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত,আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি।" এই সুভার পরিণতি কি হয়েছিল তার আভাষ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।বাকিটা পাঠকের অনুমান।

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে তারাশংকরের সাহিত্যে এসেছে অন্ধ কবিয়াল নিতাই, সাপুরে খোঁড়া শেখের মত চরিত্ররা,মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পদ্মা নদীর মাঝি' তে পঙ্গু মালা ও তার মেয়ে খোঁড়া গোপী, 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে খোঁড়া ভিখু, 'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পে প্রতিবন্ধী ভিখিরিরা, 'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে খঞ্জ নীলমণি, 'সহরতলী' উপন্যাসে খঞ্জ ধনঞ্জয়, আশালাতা সিংহের 'অন্তর্যামী' গল্পমালার জড়বুদ্ধি সম্পন্ন মেয়ে রমার করুণ পরিণতি, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'সত্যাসত্য' উপন্যাসে খঞ্জ মারউড, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'বিদূষক' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, অভিজিৎ সেন এর 'যোদ্ধা', বিমল মিত্রের 'আমি' উপন্যাসের নায়ক খোঁড়া নুটুবিহারী, সমরেশ মজুমদারে 'কালপুরুষ' উপন্যাসের নায়ক অনিমেষ প্রভৃতি বহু চরিত্র আছে যাদের জীবন যুদ্ধের কথা আমদের নতুন চিন্তার দরজা খুলে দেয়। শারীরিক অক্ষমতা সত্ত্বেও তাদের বেঁচে থাকার লড়াই, প্রাত্যহিক টানাপড়েন কীভাবে একটি কাহিনিকে বিশেষ কাহিনি করে তুলছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

শুধু সাহিত্যের জগতে নয় বাস্তব জগতেও দেখব শারীরিক বা মানসিক ভাবে অক্ষম মানুষেরা নিজেদের কীভাবে বাংলা সাহিত্য ও শিল্প চর্চার সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছেন। অন্যধারার নাট্য পরিচালক শুভাশিস গাঙ্গুলীর মত মানুষেরা গড়ে তুলেছেন 'ব্লাইন্ড অপেরা'র মত নাট্যদল। যেখানে অভিনয় করছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীরা। এরাই আবার সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করছে, নাম-'অন্য আকাশ' নামে। সেখানে প্রতিবন্ধীরাই সাহিত্যচর্চা করছেন। এই কাজ গুলো যতই হচ্ছে মনে হচ্ছে আশা হয়ত এখনও মুছে যায়নি, আলো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি। আর ঐতিহাসিক ভাবে এই তথ্যগুলো লিপিবদ্ধ করার সময় এসেছে। নইলে ইতিহাস আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

বক্ষমান গবেষণাপত্রে আমরা যে বিষয়গুলিতে বেশি জোর দেব সেগুলি হল-

১. সাহিত্য যেহেতু সমাজ চেনার হাতিয়ার সেহেতু কোন একটি গল্প বা উপন্যাসে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি ধরণের ভূমিকা পালন করছে সেটা জানা ও সচেতন পাথকদের জন্য লিপিবদ্ধ করা।

২. প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ কীভাবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করে তার অনুসন্ধান ও তথ্য আহরণ।

৩. কাহিনির পরিণতির সঙ্গে চরিত্রগুলির পরিণতি ও পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ার উৎস সন্ধান।

৪. বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যসৃষ্ট চরিত্রগুলির সমস্যামূলক চিহ্নের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

৫. বাস্তবের শারীরিক ভাবে অন্যতর সক্ষম মানুষদের সাহিত্যচর্চার অবস্থান ও খতিয়ান নির্মাণ।

সূচি

ভূমিকা

অন্যতর দৃষ্টি সক্ষম কবিদের কথা ১১

বাংলা কবিতায় অন্ধত্বের বিবর্তন ২২

বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীন অন্যতর সক্ষম : প্রসঙ্গ ও পরিণতি ৪৬

বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী অন্যতর সক্ষম চরিত্র : প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা ৬৬

বাংলা সাহিত্যে মূক ও বধির অন্যতর সক্ষম চরিত্র: অবস্থান ও পরিণতি ৮৩

বাঙলা সাহিত্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী অবস্থান, পরিণতি ও পুনর্বাসন ১০১

উপসংহার ১৩০

গ্রন্থপঞ্জী ১৩২

সাক্ষাৎকার ১৩৭

বাংলা সাহিত্যে দৃষ্টিগত অন্যতর সক্ষম :

অবস্থান, পরিণতি

অন্যতর দৃষ্টি সক্ষম কবিদের কথা

'মানসী' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে 'সুরদাসের প্রার্থনা' নামে--

'ঢাকো ঢাকো মুখ টানিয়া বসন,

আমি কবি সুরদাস।

দেবী, আসিয়াছি ভিক্ষা মাগিতে,

পুরাতে হইবে আশ'।

কে এই কবি সুরদাস? হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস থেকে জানা যায় কবি **সুরদাস** (১৪৭৮-১৫৮৩) ছিলেন মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদী সন্তকবি। তিনি হিন্দি ভাষায় ভক্তিমূলক গান রচনা করতেন। ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয় ছিল কৃষ্ণভক্তি। তাঁর রচিত পঁচিশটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'সুরসাগর' ও 'সাহিত্যলহরী' সুরদাস ছিলেন হিন্দি সাহিত্যের বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ কবি।[১] বিস্ময়ের বিষয় এই যে কবি সুরদাস ছিলেন জন্ম থেকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। দিল্লির কাছে সিরি নামক এক গ্রামে এক সারস্বত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকালে ঈশ্বরদর্শনের আকাঙ্ক্ষায়তিনি গৃহত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি উপস্থিত হন মথুরার বিক্রমঘাটে। এরপর তিনি মথুরা ও আগ্রার মধ্যবর্তী গৌঘাটে যমুনার তীরে চলে আসেন। সেখানে

১৫০৯-১০ সাল নাগাদ তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মগুরু বল্লভাচার্যের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর বল্লভাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ব্রজ অঞ্চলের চন্দ্রসরোবরের নিকট পারসৌলী গ্রামে বসতি গড়েন। মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটেছিল বলে জানা যায়।[২] পারসৌলী গ্রামেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে। এ হেন সুরদাসের একটি কবিতা হল--

'অখিয়া হরি দর্শন কী পিয়াসী।

দেখো চাহাত কমল নয়ন কো, নিশি দিন রহত উদাসী॥

কেশর তিলক মোতির মালা, বৃন্দাবনের বাসী।

নেহা লগায়ে ত্যাগী গয়ে তৃণ সম, দারি গয়ে গল ফাঁসী॥

কাহু কে মন কি কৌও কা জানে, লোগন কে মন হাসি।

সুরদাস প্রভু তুমহরে দর্শ বিন লেহো করবত কাশি' ॥

এ হেন সুরদাসের জীবনের একটি অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরদাসের প্রার্থনা কবিতাটি লিখলেন। যেখানে সুরদাসের বয়ানে কবি এই মত ব্যাক্ত করলেন যে আমাদের চাক্ষুস দৃষ্টিতে যে কালিমা যে দর্শন-বাসনা থাকে তাকে একেবারে লোপ করে অন্তর দৃষ্টিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন, সুরদাস বলেছে—

'আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে--

একাকী অসীম ভরা,

আমারি আঁধারে মিলাবে গগন

মিলাবে সকল ধরা।

আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে

আমার বিজন বাস,

প্রলয়-আসন জুড়িয়া বসিয়া

রব আমি বারো মাস’।

বিশ্ব কবিতার ইতিহাসে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যতর সক্ষম কবিদের মধ্যে যার নাম সবার আগে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন মহাকবি হোমার, যদিও তাঁর বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় রয়েছে অনেকের মধ্যে। যদিও বিশ শতকে তাঁর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মানো আর এক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্যতর সক্ষম কবি কাব্য রচনা করে অমরত্ব পেয়েছেন, তিনি হলেন জন মিল্টন। ধর্মীয় গ্রন্থ বাইবেলের কাহিনিকে ভিত্তি করে রচিত এই মহাকাব্যটি ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত হয়।

ফার্সি সাহিত্যে একটি প্রবাদ আছে, ‘সাতজন কবির সাহিত্য কর্ম রেখে যদি বাকি সাহিত্য দুনিয়া থেকে মুছে ফেলা হয়, তবু ফার্সি সাহিত্য টিকে থাকবে। এই সাতজন কবির একজন হচ্ছেন মহাকবি রুদাকি(৮৫৩ খ্রি)। ফার্সি সাহিত্যের জনক হিসেবে পরিচিত কবি রুদাকি। জন্মান্ধ এই কবি জন্মগ্রহণ করেন নবম শতাব্দীর শেষের দিকে

সমরখন্দের রুদাক জেলায়।

অন্ধ কবি রুদাকিকে স্বভাব কবিও বলা যায়। তিনি গ্রীক কবি হোমারের মতো যে কোনো মজলিসে কিংবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনর্গল কবিতা আওড়াতে পারতেন। তার স্মরণশক্তি এত প্রখর ছিল যে যেকোনো কবিতা একবার মুখে উচ্চারণ করলেই তিনি তা মনে রাখতে পারতেন। তিনি যখন কবিতা আবৃত্তি করতেন তখন তাঁর ভক্তরা তা লিখে রাখতেন। খণ্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা ও গজল বা গীতি কবিতা মিলিয়ে তিনি প্রায় তের লাখ কবিতা লিখেছেন। পৃথিবীতে এতো বেশি কবিতা খুব কম কবিরই আছে। [৩]

আরবি ভাষার খ্যাতিমান কবি বাশার ইবনে বোরদ। ৭১৪ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা ছিলেন একজন ক্রীতদাস। কবি বাশশারও ছিলেন জন্মান্ধ। কিন্তু তাঁর ছিল অসাধারণ স্মরণশক্তি ও প্রখর বুদ্ধি। তিনি ইরাকের বসরার স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর শিক্ষকরা একবার যা বলতেন জীবনে তা কখনো ভুলতেন না। কেবল শোনা এবং মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করেন। বাশশার বিন বোরদের অধিকাংশ কবিতাই ছিল অন্যায়-অবিচার এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে। অন্যায় করলে তিনি খলিফাকেও খাতির করতেন না। নব্বই বছর বয়সে খলিফার বিরুদ্ধে কবিতা লেখার অপরাধে আব্বাসীয় খলিফা আল মাহদী তাকে বন্দী করার আদেশ দেন। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। বন্দী অবস্থায় ৭৮৩ সাল নাগাদ তাঁর দেহান্ত হয়।[৪]

এতো গেল বিদেশ ও ভিন্ন ভাষার কবিদের কথা। বাংলা ভাষায় কবিতা চর্চা করছেন দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধী কবি তা বিরল হলেও একেবারেই অপ্রাপ্য নয়। তেমনি একজন কবি হলেন সঞ্জীব রজক। সঞ্জীব রজকের জন্ম ১৯৭৯ সালে। তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ও বর্তমানে অধ্যাপক। তিনি এম.ফিল গবেষণা করেছেন বাংলা ছোটোগল্পে অন্ধত্ব নিয়ে। তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘আগুন তোমাকে স্পর্শ করুক’, দ্বিতীয় বইয়ের নাম ‘স্মৃতির জলসাঘরে’, তৃতীয় বই তৃতীয় নয়ন(২০১৮), এবং চতুর্থ বই ‘সাতকাহন’(২০১৯)।

কবি সঞ্জীব রজকের সাহিত্য দর্শন সম্পর্কে জানা যায় তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে। যেখানে তিনি বলছেন—‘কবিতা লিখে বিপ্লব করা যায় না। কিন্তু যদি মানুষের মন নামক আতসবাজিতে আগুনের স্ফুলিঙ্গটুকু সঞ্চার করতে পারি যাতে শুরু হতে পারে ভাব ও কল্পনার বিচিত্র বিচ্ছুরন, কবি হিসেবে সার্থকতা সেখানেই। সহজ কথায় মানুষের কল্পনা ও বোধের দরজায় টোকা দেওয়ার চেষ্টা মাত্র, আর কিছু নয়’। [৫]

আবার নিজের দৃষ্টিহীনতা সম্পর্কে বলেন—

‘পাঠক পাঠিকাদের জন্য বলে রাখা দরকার যে, আমি আজ পর্যন্ত আমার জীবনে দৃষ্টিহীনতাকে অতিক্রম করে দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করে চলেছি। তবু কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা সেই দৃষ্টিভঙ্গি ততখানি গড়ে ওঠেনি, যতখানি গড়ে উঠেছে ইতিহাস ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে’। [৬]

একজন দৃষ্টিহীন কবি এবং একজন স্বাভাবিক কবির কবিতার মধ্যে কি কোনো সাধারণ পার্থক্য থাকে? অনুসন্ধান করতে গিয়ে বারবার যে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে চেয়েছি ইমেজ তৈরির ক্ষেত্রে হয়তো বা এই পার্থক্য থাকতে পারে। কারণ একজন জন্মান্ধ কবি তো জগত দেখেন নি, প্রকৃতি দেখেননি, তাহলে তিনি কিভাবে ইমেজ তৈরি করবেন? কিভাবে অনুভব করবেন ডুমুর গাছের পাতার নিচে ভোরের দোয়েল পাখির চিত্রকল্প? কিংবা পাখির নীড়ের মতো চোখের চিত্রকল্প?

জন্মান্ধ কবি রুদকির একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ফারসি থেকে ইংরাজিতে অনূদিত কবিতাটি ছিল এইরকম—

'Look at the cloud, how it cries like a grieving man
Thunder moans like a lover with a broken heart.
Now and then the sun peeks from behind the clouds
Like a prisoner hiding from the guard.'[৭]

মেঘ সূর্যকে নিয়ে এই যে চিত্রকল্প নির্মিত হল কবি কি দেখেছেন কোনোদিন? কবি কি দেখেছেন কিভাবে কারারক্ষীর পিছনে বন্দী লুকিয়ে থাকে। একজন জন্মান্ধ কবির পক্ষে এই দেখা সম্ভব নয়। হয়তো লোকের মুখে শুনে শুনে এই দর্শন হয় কখনো। আমারা যেমন স্বপ্নের মধ্যে নতুন কোনো অজানা জগতের ছবি দেখি। একজন দৃষ্টিহীন মানুষ কি কখনও স্বপ্ন দেখেন? হয়তো অন্য কোনো সাহিত্যে কিংবা গল্পে তিনি ক্রমশ অন্ধকার

থেকে দৃশ্যের দিকে যান। কবি সঞ্জীব রজকের কবিতায় হয়তো তেমনি কিছু চিত্রকল্প নির্মিত হয়। যেমন তৃতীয় নয়ন কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় তিনি লিখছেন—

'ছুটে যায় নিষাদের তীর,
আর্তনাদে থেমে যায় আদরের ভাষা।
কবির তৃতীয় চোখে বাষ্প জমা হয়—
বেদনার উৎস থেকে জন্ম নিল শ্লোক
বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন—
প্রেমের প্রথম সঙ্গীত'।[৮]

তৃতীয় নয়ন তো আসলে সেই অন্তরদৃষ্টি।অন্য অর্থে যাকে বলা হয় সুচেতনা। মাথার মধ্যে যে অজস্র দৃশ্যের জন্ম হয়, তা কি দেখতে পায় দৃষ্টিহীন কবি? এই যে জগত সংসার ক্রমাগত প্রবাহিত হয়, সকাল থেকে রাত রাত থেকে ভোর পর্যন্ত, এর প্রতিটি ক্ষণের গন্ধ বর্ণ শব্দ দৃশ্য অনুভূতি আছে। এই সমস্ত অনুভূতির মধ্যে শুধু বর্ণ ও দৃশ্য অনুভূতি বাদ দিলে থাকে গন্ধ, শব্দ। সেই অনুভূতির জগত দিয়ে নির্মিত হয় একজন দৃষ্টিহীনের জগত। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'তৃতীয় নয়ন' উপন্যাসের নায়ক মিহিরের অন্ধ হবার মুহূর্তটি সুন্দর কাব্যিক ভাষায় তুলে ধরেছিলেন —

'এখানে সময় পড়েছে থেমে, আকাশ গেছে মুছে, সমস্ত সৌরজগৎ গেছে হারিয়ে, কানের কাছে শব্দ করে উঠছে শুভ্রতার স্তব্ধ কোলাহল। দুই চোখে এতো সাদা যেন সহ্য করা যায় না,দুই হাতে বহন করা যায় না শূন্যতার এত ভার '।

নায়ক মিহির অন্ধত্বের অন্ধকারকে বলেছিল 'রৌদ্রআলোকিত অন্ধকার', কবি সঞ্জীব রজকের কবিতায় দেখি তিনি শব্দচিত্র তৈরি করছেন—

'শব্দ হৃদয়ে ছবি আঁকে—
নদীটির কুলুকুলু স্বরে,
হাওয়ায় পাতার মরমরে,
একা কোনো ডাহুকের ডাকে
হৃদয়ে শব্দ ছবি আঁকে'।[৯]

একথা অস্বীকারের উপায় নেই যে পার্সিয়ান রুদাকি, আরাবিয়ান কবি বাসরার, হিন্দি সাহিত্যের সুরদাস, আইরিশ কবি এন্তনি রাফতারি, আমেরিকান কবি ফ্যানি ক্রসবি, ইহুদি কবি পেনিনা মইস, সুফি কবি আব্দুল আল মারি, তুর্কি কবি আসিফ ভেইসেল কিংবা বাংলা ভাষার সঞ্জীব রজক অধিকাংশ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কবির কবিতায় চিত্রকল্পের চেয়ে বানীর আধিক্য বেশি তা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় আমেরিকান মহিলা কবি ফ্যানি ক্রসবির কথা। তিনি দৃষ্টিহীন অন্যতর সক্ষমদের জন্য আমেরিকান সেনেট কংগ্রেসে কবিতা পাঠ করেছিলেন—

'O ye, who here from every state convene,
Illustrious band! May we not hope the scene
you now behold will prove to every mind
Instruction hath a ray to cheer the blind'.[১০]

দৃষ্টিহীন হিসেবে নিজেদের অন্তর্বেদনা কী প্রকাশিত হয় কোথাও? এই প্রশ্নটাও মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছে বারবার। আর এর উত্তর খুঁজেছি তাঁদের কবিতার মধ্যে। কোথাও উত্তর মিলেছে কোথাও মেলেনি। যেমন তুর্কি কবি আসিফ ভেইসেলের কবিতায়, যেখানে লিখছেন—

‘I am on a long and narrow road,
I walk day and night;
I do not know what state I am in
I walk day and night;

The moment I came into the world,
I walked at the same time
At an inn with two doors
I walk day and night.

I walk even while sleeping,
I am looking for a reason to stay
I always see the ones that left
I walk day and night.’[১১]

ঠিক এর পাশে আমরা রাখতে পারি এই দশকের কবি সঞ্জীব রজকের কবিতা—

‘একটা মানুষ ব্যর্থ হল প্রেমে,

একটা মানুষ লড়ছে একা-একা,

একটা মানুষ স্তব্ধ হয়ে আছে

একটা সূর্য বিস্ফোরণের আগে।

একটা মানুষ জর্জরিত বিষে,

সাধনা তার অমৃতের তরে

সেই ছবিটা আঁকতে যদি পারি

সাজিয়ে তুলি অক্ষরে অক্ষরে’।[১২]

এইভাবে সম্পূর্ণ হয় একটি বৃত্ত। দৃষ্টিহীনতা থেকে আলোর পথে যাত্রার। অন্য এক জগতের সন্ধানে।

উল্লেখপঞ্জী

১. হিন্দি সাহিত্যের ইতিহাস, বিজয়েন্দ্র স্নাতক (জ্যোতির্ময় দাশ :বাংলা অনুবাদ), সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০০৯, পৃ৯৮-৯২ .

২. Devotional Poets and Mystics, Part II, Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1991, p. 1-7

৩. Sassan Tabatabai, "Father of Persian Verse: Rudaki and His Poetry", Amsterdam University Press, Feb 15, 2011.

৪. Meisami, Julie Scott; Starkey, Paul, eds. (1998). Encyclopedia of Arabic Literature. London: Routledge. ISBN 9780415185714.

৫. সঞ্জীব রজক। কবি কথা। তৃতীয় নয়ন। কগনিশন পাবলিকেশন। ২০১৮।

৬. তদেব।

৭. Sassan Tabatabai, 2011.

৮. সঞ্জীব রজক। তৃতীয় নয়ন। ২০১৮। পৃষ্ঠা ১৩

৯. সঞ্জীব রজক। তৃতীয় নয়ন। ২০১৮। পৃষ্ঠা ১৯

১০. The Lincoln Daily Star, February 12, 1915.

১১. Asik Veysel (Turkish). Ahmet Altay Orhan Yorgancý. 2013

১২. সঞ্জীব রজক। সাতকাহন। ২০১৯। পৃষ্ঠা ২০।

বাংলা কবিতায় অন্ধত্বের বিবর্তন

অন্ধত্ব কাকে বলে? দেশ ও মানুষ বদলালে অন্ধত্বের ধারণাগত পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অন্ধত্বকে বিভিন্ন মাপকাঠিতে বিচার করে। ফিনল্যান্ডের আইন অনুযায়ী যে ব্যাক্তি নতুন দৃষ্টি শক্তির অভাবে পথ হারিয়ে ফেলেন তিনি দৃষ্টিহীন হিসেবে চিহ্নিত হবেন। ইরানে আবার দৃষ্টিহীন তাকেই বলা হবে যার দুটো চোখেই দৃষ্টিশক্তি নেই। ইজিপ্টে এক মিটার দূরত্বে যিনি হাতের আঙুল গুনতে পারবেন না তিনই হবেন অন্ধ ব্যক্তি। তবে সব দেশেই অধিকাংশ সাধারণ মানুষের ধারণা এই যে, যার কোনও দৃষ্টি শক্তি নেই তিনই অন্ধ এবং যিনি অন্ধ তিনি চোখে শুধু অন্ধকারই দেখেন। কিন্তু বাস্তব হল এই যে যারা তথাকথিত দৃষ্টিহীন বা অন্ধ তাঁদের অনেকেই চোখে আবছা আলো, চলমান ছায়া দেখতে পান। মাত্র দশ শতাংশ দৃষ্টিহীন মানুষ চোখে সম্পূর্ণ অন্ধকার দেখেন। [১]

ভারতীয় দৃষ্টিতে বা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন অথবা যে ব্যক্তি ভালো লেন্স পরার পর যার দৃষ্টি তীক্ষ্ণতা ৬/২০ মিটার-এর বেশি হবে না অথবা যে ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষেত্রের সীমা ২০° এর কম হবে তিনি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হিসেবে চিহ্নিত হবেন। এ তো গেল আইনের কথা, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিহীনতা শুধু চোখে নয়, মনের দৃষ্টিকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ যখন লেখেন –

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার
আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া"।[২]

তখন অন্ধত্বের সংজ্ঞা নতুন করে নির্মাণ করতে হয়। আসলে সাহিত্যে অন্ধত্ব বিষয়টি বহু ভাবে এসেছে। কথা সাহিত্যে অন্ধত্বের বাস্তব প্রেক্ষাপট যেখানে কোনও দৃষ্টিহীন চরিত্রের হাতে নির্মিত হয়েছে, কিন্তু কবিতায় তা নির্মিত হয়েছে উপমা বা রূপকের আঙ্গিকে। চরিত্র হিসেবেও যে কবিতার মধ্যে অন্ধত্ব আসে নি তা কিন্তু নয়। তবে সেটা খুব সীমিত ক্ষেত্রে।

প্রথমে ঋকবেদ সংহিতায় অন্ধত্বের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। যেখানে প্রথম মণ্ডলের ১২০ নম্বর সুক্তে বলা হয়েছে- 'স্থলগতি ঋষির স্তোত্র (অন্ধ ঋজ্রাশ্বের অর্থাৎ) শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্মের প্রতিপালকদ্বয়সে আমার ন্যায় স্তুতি করে চক্ষু পেয়েছিল !, অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও'। এই প্রার্থনা আসলে অশ্বিদ্বয়ের কাছে। দেবতার স্তুতি করে অন্ধত্ব নিবারণের এই ঘটনার মধ্যে অলৌকিকতার পাশাপাশি ব্যঞ্জনাও রয়েছে। দ্বিতীয় মণ্ডলেরর তেরো নম্বর সুক্তে বলা হয়েছে- 'হে ইন্দ্র তুমি তুর্বীতি ও বয্য যাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হতে পারে তার পথ করে দিয়েছ, তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে তল হতে উদ্ধার করে আপনাকে কীর্তিমান করেছে। অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য'। এখানেও

রয়েছে অন্ধকে কৃপাকারী দেবতা ইন্দ্রের মহিমা কীর্তন। আবার চার নম্বর মণ্ডলের উনিশ নম্বর সুক্তে রয়েছে-

'ভাম্রিভিহ পুত্রামাগ্রুভ আদানাম নিভেসানাদ্ধারিভা আ জাভার্থা ।

ভ্যান্ধ আখ্যাদাহিমাদাদান নির্ভুদুখাচ্ছিৎসামারান্তা পার্ভা' ।।[৩]

অর্থাৎ, হে হরিবান! তুমি বম্রী কর্তৃক ভক্ষিত অগ্রুর পুত্রকে গৃহ হতে বাইরে এনেছিলে। বাইরে আনবার সময় সে অন্ধ হলেও অহিকে দেখতে পেয়েছিল। সে নির্গত হবার পর তার বম্রী কর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থীদেশ সকল সংযুক্ত হয়েছিল। হরিবান অর্থে এখানে ইন্দ্রকেই বোঝাচ্ছে। অন্ধ হয়েও অহিকে দেখার মধ্যে দেব মহিমার প্রকাশ রয়েছে।

বেদের পর যদি আমরা দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখব দুটি কাব্যেই অন্ধত্বের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রামায়ণের কাহিনির সুত্রপাতের মূলেই রয়েছে অন্ধমুনির অভিশাপ। গল্পটা ছিল এই যে একবার যৌবনে দশরথ শিকারকালে গভীররাত্রে কলসিতে জল পূর্ণরত এক মুনিকুমারকে জলপানরত হাতি ভেবে শব্দভেদী বাণের সাহায্যে হত্যা করেন । দশরথ যখন মুনিকুমারকে তাঁর অন্ধ পিতার কাছে নিয়ে যান তখন অন্ধমুনি এই বলে অভিশাপ দেন :

'পুত্রব্যসনজং দুঃখং যদেতন্মম সাংপ্রতম্।

এবং ত্বং পুত্রশোকেন রাজন্ কালং করিষ্যসি' ।।[৪]

অর্থাৎ, হে রাজন, তুমি যেভাবে আমাকে পুত্র-বিরহ-দুঃখ দিয়েছ, একই ভাবে তুমিও পুত্রশোকে প্রাণ হারাবে । এই অভিশাপই তো রামায়ণ কাব্যের মূল চালিকাশক্তি।

মহাভারতে আবার গোটা পর্ব জুড়ে এক অন্ধ রাজার হাহাকারের কাব্য। ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর জন্ম কাহিনিতে তাঁর অন্ধত্বের এক অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা লুকিয়ে আছে। সেকালের রাজাধিরাজদের অন্দরমহলের কেচ্ছার গল্প। সেকালের নিয়ম ছিল কোন রাজার অপুত্র অবস্থায় মৃত্যু হলে বংশ রক্ষার জন্য রানী দেবরদের সঙ্গে মিলিত হতে পারতেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে জানা মহাভারতে যে গল্পটি রয়েছে সেটি এই যে, বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হলে বংশ রক্ষার্থে তার মাতা সত্যবতী কুমারী অবস্থায় গর্ভজাত পরাশর মুনির পুত্র ব্যাসদেবকে ডাকেন। সত্যবতীর ইচ্ছায় ব্যাসদেব অম্বিকার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে গর্ভবতী করেন। মিলনের সময়ে ব্যাসদেবের কুৎসিত মূর্তি দর্শন করে অম্বিকা ভয়ে চোখ বন্ধ করায় তার পুত্র জন্মান্ধ হয়। [৫]

কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে অন্য একটি উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র পূর্ব জন্মে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। সেসময় ক্ষত্রিয়রা হরিণের মাংস ভক্ষন করতো। একদিন রাজা হরিণ শিকারে জঙ্গলে যান এবং তিনি হঠাৎ একটি হরিণ দেখতে পান। হরিণটিকে ধরার জন্য তিনি হরিণটির পেছনে ছুটতে লাগলেন। এভাবে হরিনটির পেছনে ছুটতে ছুটতে তিনি গভীর জঙ্গলে পৌঁছে যান।সূর্য তখন ডুবুডুবু। ফলে রাজা প্রাসাদে ফিরতে না পেরে জঙ্গলে থেকে যান। বাধ্য হয়ে তিনি জঙ্গলের একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেন। গাছের ডালপালা ভেঙে গাছটির নিচে আগুন জ্বালিয়ে নেন। রাজা ছিলেন

খুবই ক্ষুধার্ত। তিনি যে গাছটির নিচে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন সেই গাছটির ওপরেই ছিল এক পাখির বাসা। পাখির বাসাটিতে একশো ছানা সহ এক পাখি পরিবার বসবাস করত। বাবা-পাখি মা-পাখিকে বলল যে, রাজা খুবই ক্ষুধার্ত আমাদের উচিত রাজাকে খাওয়ানো। বাবা পাখি তাই বললো সে আগুনে ঝাপ দিয়ে রাজার ভক্ষ্য হবে। মা পাখিটি বললো যে সে মারা গেলে ছানাদের কষ্ট হবে তাই মা পাখিটি মরে যেতে চাইলো। এইভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে হঠাৎ মা পাখিটি গাছ থেকে পড়ে যায় এবং আগুনে ঝলসে যায় । ক্ষুধার্ত রাজা তার তীর দিয়ে আগুন থেকে পাখিটিকে উঠিয়ে খায়। কিন্তু এইটুকু খাবার পর রাজার ক্ষিধে আরও বেড়ে যায়। রাজা তখন গাছের ওপরে তাকিয়ে দেখতে পায় গাছের ওপরে আরো পাখি আছে । রাজা তখন গাছ বেয়ে ওপরে উঠে বাবা- পাখি আর তার ছানাগুলো নামিয়ে আনে । রাজা তার তীর দিয়ে ছানাগুলোর চোখে গেথে দিয়ে ছানাগুলোকে ঝলসে খেতে থাকে। আর তার এই কৃতকর্মের জন্যই তিনি পরের জন্মে জন্মান্ধ হয়ে জন্মান এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাকে শত পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শুনতে হয়।[৬]

পুরাণের গল্প যাই হোক না কেন কোনো মানুষের অন্ধত্বের কারণ হিসেবে নারী-পুরুষের যৌনগত সমস্যা কিংবা কর্মফল কোনটিই যুক্তিসম্মত নয়। ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অফ ব্লাইন্ডনেস(১৯৬৬) শিশুর জন্ম-পরবর্তীকালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীত্বের যে যে কারণ ও কারণগুলির শতকরা হারের তালিকা পেশ করেছে তা এই রকম—

১. যে অন্ধত্বের কারণ জানা নেই-- ৩৯ শতাংশ

২. সাধারণ রোগভোগের ফলে—২৫ শতাংশ

৩. জন্মের পরবর্তী কোনও কারণে—২০ শতাংশ

৪. বিভিন্ন কারণ—৬ শতাংশ

৫. অনিশ্চিত কারণ—১০ শতাংশ

ফ্রেসার ও ফ্রাইডম্যান (১৯৬৮) দৃষ্টিহীনতার কারনগুলিকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমেই তাঁরা উল্লেখ করেছেন বংশগত বা জেনেটিক কারণকে। প্রায় ৪২.১ শতাংশ শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ হিসেবে বংশগতিকে দায়ী করা হয়। এই রোগে সাধারণত চোখে টিউমার হয়, ফলে চোখকে তুলে ফেলতে হয়। জেনেটিক কারণ ছাড়াও আর যে তিনটি সমস্যাকে কে অন্ধত্বের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তার মধ্যে শিশুর জন্মের আগের কোনো সমস্যা, শিশুর জন্মকালীন সময় ও শিশুর জন্ম পরবর্তী সময়কে ধরা হয়। ফ্রেসার ও ফ্রাইডম্যান শিশুর জন্মের আগে ৬ শতাংশ শিশুর দৃষ্টিহীনতার কারণ হিসেবে মায়ের গর্ভাবস্থায় রুবেলা, সিফিলিস, গুটিবসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগকে দায়ী করেছেন। ফ্রেসার ও ফ্রাইডম্যান শিশুর জন্মের সময় কম ওজন বা অপরিণত গঠনকে অন্ধত্বের জন্য দায়ী করেছেন। এই ধরণের সমস্যা ৩৩.২ শতাংশ শিশুর মধ্যে দেখা যায়। মূলত অপরিণত শিশুকে ইনকিউবিটরে রাখলে যে অক্সিজেন দিতে হয় তার ফলে শিশুর রেটিনা আক্রান্ত হয়। শিশুর জন্ম পরবর্তীকালীন যে সমস্যাগুলির জন্য অন্ধত্ব আসতে পারে তার মধ্যে জীবাণু আক্রমণ, অ্যাকসিডেন্ট, চোখে টিউমার অপুষ্টি ইত্যাদি নানাবিধ কারণ থাকতে পারে। ফ্রেসার ও ফ্রাইডম্যান এই ধরণের সমস্যায় ৭.৭ শতাংশ শিশুর অন্ধত্বের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং খুব বাস্তব দৃষ্টিতে ভাবলে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধত্বের কারণ হিসেবে যৌন মিলন কালে অম্বার চোখ বন্ধ রাখাকে দায়ী করা যায় না। জঙ্গলে অসাস্থ্যকর পরিবেশে থাকা বিচিত্রবীর্যের বহন করা জীবানুকে দায়ী করা যায়।[৭]

বাংলা সাহিত্যে ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্ধত্বকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ করে ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন কবি। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। 'গান্ধারীর প্রার্থনা' কবিতায় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্যোধনকে উদ্দেশ্য করে বলেছে–

'অন্ধ আমি। – অন্ধ আমি অন্তরে বাহিরে
চিরদিন – তোরে লয়ে প্রলয়তিমিরে
চলিয়াছি' [৮]

অন্ধত্বকে তিনি পুত্রস্নেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এক অন্ধত্ব তাঁর চোখে হলেও আর এক অন্ধত্ব ছিল তাঁর অন্তরে। তাই পুত্র দুর্যোধনের অন্যায় দেখেও তিনি মুখ বুজে সব সহ্য করেছেন। আর এই স্নেহান্ধের জন্য আজ কুরু বংশ ধংসের মুখে। তাই ভবিষ্যৎবাণী করেন সম্ভাব্য ফলাফলের কথা মাথায় রেখে–

'কুরুবংশরাজলক্ষ্মী নাহি রবে আর –
শুধু রবে অন্ধ পিতা, অন্ধ পুত্র তার,
আর কালান্তক যম – শুধু পিতৃস্নেহ
আর বিধাতার শাপ, আর নহে কেহ'।[৯]

পিতা যেমন স্নেহে অন্ধ, পুত্র তেমনি অহংকারে অন্ধ। দুই অন্ধত্বের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্তর্দৃষ্টি। অন্তরের এই অন্ধত্বকে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বহু কবিতায় এই অন্ধত্বকে ব্যবহার করেছেন। অন্ধত্বকে তিনি অজ্ঞানতা হিসেবে দেখিয়েছেন গানে –

'আমি   যখন ছিলেম অন্ধ

সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাই নি তো আনন্দ'।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের 'দুঃসময়' কবিতায় বিহঙ্গকে অন্ধ বলেছেন কবি। আকাশে যে পাখি উড়ে চলেছে তার ডানা বন্ধ করতে মানা করছেন কবি। থেমে যাওয়ার মধ্যে একধরনের পরাজয় আছে, তাই চলার ছন্দেই বেঁধে নিতে হবে জীবনের সবকটি সেতার। উড়ন্ত সেই পাখির উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বান—

'ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন,

ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা বসে ক্রন্দন,

ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজরচনা।

আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন

উষা-দিশা-হারা নিবিড়-তিমির-আঁকা--

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,

এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা'।

বেশকিছু গানে রবীন্দ্রনাথ অন্ধ শব্দটি ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন ভাবে। যেমন নাট্যগীতির ৫৩ নম্বর কবিতায় লিখেছেন—

'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে   অন্ধ বালিকা

পত্রপুটে আনিয়া দিল পুষ্পমালিকা'।

পূজা পর্যায়ের একটি গানে লিখেছেন—

'নিত্য চকিত চঞ্চল চিত কর' নিঃসংশয়।

তিমিররাত্রি, অন্ধ যাত্রী,'

'নৈবেদ্যে' কাব্য গ্রন্থের ৪৯ নম্বর কবিতায় অন্ধত্বকে প্রতিকায়িত করে লিখেছেন—

'অন্ধকার গর্তে থাকে অন্ধ সরীসৃপ;

আপনার ললাটের রতনপ্রদীপ

নাহি জানে, নাহি জানে সূর্যালোকলেশ।

তেমনি আঁধারে আছে এই অন্ধ দেশ'

'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের ২০৪ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

'যাওয়া-আসার একই যে পথ

জান না তা কি অন্ধ?

যাবার পথ রোধিতে গেলে

আসার পথ বন্ধ'।

এই কাব্যগ্রন্থের ৮০ সংখ্যক কবিতায় লিখেছেন—

'চাও যদি সত্যরূপে

দেখিবারে মন্দ--

ভালোর আলোতে দেখো,

হোয়ো নাকো অন্ধ'।

কিছু ক্ষেত্রে চরিত্র হিসেবেও দৃষ্টিহীন চরিত্রদের তুলে ধরেছেন তিনি। যেমন চিত্রা কাব্যগ্রন্থে আছে অন্ধ বালিকার কথা—

'একদা প্রাতে কুঞ্জতলে

অন্ধ বালিকা

পত্রপুটে আনিয়া দিল

পুষ্পমালিকা'।

'সহজ পাঠ'এর অন্ধ কানাইয়ের কথা কে ভুলতে পারে—

'অন্ধ কানাই পথের ' পরে

গান শুনিয়ে ভিক্ষে করে'!

কিছু কবিতায় অন্ধত্বের সঙ্গে উপমা বা রূপক নির্মাণ করেছেন, যেমন—

১. তুরঙ্গসম **অন্ধ** নিয়তি (কথা, গুরু গোবিন্দ)

২. কে চাহে সংকীর্ণ **অন্ধ** অমরতাকূপে (উৎসর্গ, ৪৬ সংখ্যক)

৩. **অন্ধ** তামস গেছে কিনা ছুটি (পুরবী, সুপ্রভাত)

৪. **অন্ধ** কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে (পুনশ্চ, শিশুতীর্থ)

৫. মূর্তিহীন ব্যর্থতায় নিত্য **অন্ধ** আন্দোলন তুলি (পুরবী, সমুদ্র)

৬. বিহঙ্গগান শান্ত তখন **অন্ধ** রাতের পক্ষছায় (পুরবী, বিজয়ী)

৭. এ কী ঘোর প্রেম **অন্ধ** রাহুপ্রায়। (মায়ার খেলা)

রবি ঠাকুরের গানে বহুবার অন্ধত্বকে ব্যবহার করা হয়েছে। আলাদা করে সেইসব উল্লেখ না করাই ভালো। তবে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে অন্ধত্বকে এই ভাবে বিভিন্ন রূপক ও প্রতীক হিসেবে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে কবিতায়।

তবে কিছু কিছু কবিতায় অন্ধত্বের জগতকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। আমাদের সমাজে দৃষ্টিহীনদের প্রতি যে নেতিবাচক মানসিকতা থাকে এই সব কবিতায় তার বিপরীত চিত্র আঁকা হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সুকুমার রায়ের ‘অন্ধ মেয়ে’ কবিতাটি। যেখানে তিনি অন্ধ মেয়ের জগতকে উন্মোচন করতে চেয়ে সেই জগত যে আমাদের দেখা জগতের চেয়ে স্বাদে গন্ধে বর্ণে সম্পূর্ণ আলাদা সেকথা বলতে চেয়েছেন-

‘গভীর কালো মেঘের পরে রঙিন ধনু বাঁকা,
রঙের তুলি বুলিয়ে মেঘে খিলান যেন আঁকা!
সবুজ ঘাসে রোদের পাশে আলোর কেরামতি
রঙিন্ বেশে রঙিন্ ফুলে রঙিন্ প্রজাপতি!

অন্ধ মেয়ে দেখছে না তা – নাইবা যদি দেখে-
শীতল মিঠা বাদল হাওয়া যায় যে তারে ডেকে!

শুনছে সে যে পাখির ডাকে হরেক কোলাকুলি

মিষ্ট ঘাসের গন্ধে তারও প্রাণ গিয়েছে ভুলি!

দুঃখ সুখের ছন্দে ভরা জগৎ তারও আছে,

তারও আঁধার জগৎখানি মধুর তারি কাছে’।[১০]

রবীন্দ্র অনুসারী কবিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যতীন্দ্র মোহন বাগচী। তাঁর ‘অন্ধ বধূ’ কবিতা খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল সেই সময়। এখনও পড়লে কবিতাটির মধ্যে যে মাধুর্য রয়েছে একজন অন্ধ নারীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমরা তা প্রত্যক্ষ করতে পারি। দৃষ্টিহীনদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অন্যান্য ইন্দ্রিয় যে স্বাভাবিকভাবে প্রখর হয় এই কবিতাটি যেন সে কথার প্রমাণ দেয়। কবিতার শুরুতে এক অন্ধ গৃহবধূ ঠাকুরঝির সঙ্গে যেতে যেতে পায়ে ফুলের স্পর্শে বুঝতে পারে কি ফুল সেটি, কিংবা বাতাসের গন্ধে বলে দিতে পারে কোন কাল আসছে-

‘পায়ের তলায় নরম ঠেকল কী!

আস্তে একটু চলনা ঠাকুর-ঝি —

ওমা, এ যে ঝরা-বকুল ! নয়?

তাইত বলি, বসে’ দোরের পাশে,

রাত্তিরে কাল — মধুমদির বাসে

আকাশ-পাতাল — কতই মনে হয় ।

জ্যৈষ্ঠ আসতে কদিন দেরি ভাই —

আমের গায়ে বরণ দেখা যায় ?

—অনেক দেরি? কেমন করে’ হবে !

কোকিল-ডাকা শুনেছি সেই কবে,

দখিন হাওয়া —বন্ধ কবে ভাই ;

দীঘির ঘাটে নতুন সিঁড়ি জাগে —

শেওলা-পিছল — এমনি শঙ্কা লাগে,

পা-পিছলিয়ে তলিয়ে যদি যাই!

মন্দ নেহাৎ হয়না কিন্তু তায় —

অন্ধ চোখের দ্বন্ধ চুকে’ যায়’!

শুধু দৃষ্টিহীনের অনুভূতির জগৎ নয়, তার যন্ত্রণার জগতকেও কবি টুকরো টুকরো বাক্যের সাহায্যে বাঙময় করেছেন কবি। এই জগত আসলে বঙ্কিমের অন্ধ রজনীর জগত। যে প্রতিটি স্পর্শকে আলাদা আলাদা করে চিনে নিতে পারে। প্রত্যেকটি স্পর্শকে বিভিন্ন ফুলের স্পর্শের সঙ্গে তুলনা করে সে। এটাই তাঁর অন্যতর সক্ষমতা। অন্ধ বধূর জ্যৈষ্ঠকে চিনে নেবার এই অনুভূতি কিন্তু পরক্ষণে বদলে যায় বেদনায়। সেই বেদনা আসলে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের বঞ্চনার বেদনা। সে বলে—

‘দুঃখ নাইক সত্যি কথা শোন্ ,
অন্ধ গেলে কী আর হবে বোন?
বাঁচবি তোরা —দাদা তো তার আগে?
এই আষাঢ়েই আবার বিয়ে হবে,
বাড়ি আসার পথ খুঁজে’ না পাবে —
দেখবি তখন —প্রবাস কেমন লাগে’ ?

স্বামী থাকেন প্রবাসে, একাকীত্বের এই যন্ত্রণার পাশাপাশি রয়েছে দৃষ্টিহীন বলে প্রেম-হীনতার কষ্ট। তাই সে বলে—

‘আসুন ফিরে’ — অনেক দিনের আশা,
থাকুন ঘরে, না থাক ভালবাসা —
তবু দুদিন অভাগিনীর কাছে!
জন্ম শোধের বিদায় নিয়ে ফিরে’ —
সেদিন তখন আসব দীঘির তীরে’।

অন্ধ নারীর এই মানসিক অবস্থার কারণ আমরা কেন জানি। ফলে কবিতার শুরুতে যে ভালো লাগা বা যে নান্দনিক বোধ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল তা ক্রমাগত ভেঙে যেতে থাকে। আসলে এই ধাক্কাটা কবি দিতে চেয়েছেন সচেতনভাবে। অনুভূতির জগত থেকে এই কবিতা আমাদের কঠোর বাস্তবের জগতে নিয়ে এসেছে। তাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে

অন্ধ বধূর চরম পরিণতি ভাবা হয়েছে। অন্ধত্ব এক ধরণের দীর্ঘ একঘেয়েমি জীবনের মতো। কারণ সে জীবন রংহিন,ছবি হীন, দিন রাত্রিহীন, সৌন্দর্যহীন। অন্ধ বধূ তাই বলে—

'টানিস কেন? কিসের তাড়াতাড়ি —
সেই তো ফিরে' যাব আবার বাড়ি,
একলা-থাকা-সেই তো গৃহকোণ —
তার চেয়ে এই স্নিগ্ধ শীতল জলে
দুটো যেন প্রাণের কথা বলে —
দরদ-ভরা দুখের আলাপন'

কিন্তু এক ঘেয়েমির স্বাদ কতটুকু আর। কবিতাটির সময়কাল যেহেতু বিশ শতক, সেহেতু সেই সময়ের দৃষ্টিহীন মানুষের জীবন যাপনের একটি চিত্র আমরা পাচ্ছি। বিশেষত নারী জীবনের। অন্ধত্ব মানেই সেই সময় মনে করা হত পাপের ফল, যার পরিণতি ছিল খুবই কষ্টের। আর তাই এই অন্ধ বধূটি সেই অন্তিম পরিণতির ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন—

'তারপরে - এই শেওলা-দীঘির ধার —
সঙ্গে আসতে বলবনা'ক আর,
শেষের পথে কিসের বল' ভয় —
এইখানে এই বেতের বনের ধারে,

ডাহুক-ডাকা সন্ধ্যা-অন্ধকারে —

সবার সঙ্গে সাঙ্গ পরিচয়।

শেওলা দীঘির শীতল অতল নীরে —

মায়ের কোলটি পাই যেন ভাই ফিরে'!

রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতার জগতে সবচেয়ে আলচিত নামটি হল জীবনানন্দ দাস। তাঁরও বহু কবিতায় অন্ধত্বের প্রসঙ্গ এসেছে বারবার। তাঁর 'মহাপৃথিবী'(১৯৪৪) কাব্যগ্রন্থে একটি কবিতায় আছে-- 'স্থবির সিংহ এক অন্ধ - আফিমের সিংহ -- অন্ধকার'।

'বেলা অবেলা কালবেলা'(১৯৬১) কাব্যগ্রন্থে রয়েছে--

'অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে

তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে;'

বাংলা কবিতায় অন্ধত্ব বার বার প্রতীকরূপে ফিরে এসেছে। সেইসব কবিতার মধ্যে অন্যতম একটি কবিতা হল কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'অন্ধের সমাজে একা'। কবিতার কথক নিজেকে অন্ধের দেশের সেনাপতি হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন।

'রাস্তার দুইধারে আজ সারিবদ্ধ দাঁড়িয়েছে অন্ধ সেনাদল;

আমি চক্ষুষ্মান হেঁটে যাই'

অন্ধ সেনাদল এখানে প্রতিকায়িত হয়েছে। অর্থাৎ সেনারা তো অন্ধের মতো, তাঁরা যুদ্ধ কেন করছে নিজেরাই জানে না। এমনকি এই সেনাদলের সেনাপতি, অর্থাৎ এই কবিতার কথক 'আমি' তিনি কিন্তু চক্ষুস্মান। তিনিও জানেন না কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, কেন যুদ্ধ করতে হবে।

> 'আমি একা দেখতে পাই, আমি একা দেখতে পাই, আমি
>
> দশ লক্ষ যুযুধান অন্ধের সভায় আজ একা।
>
> অথচ অন্ধের দেশে একা চক্ষুষ্মান হওয়া খুব ভয়াবহ'।

কারণ, একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব অন্যায় চোখে দেখার মধ্যে বিড়ম্বনা থাকে, যন্ত্রণা থাকে। একলা প্রতিবাদও অনেক ক্ষেত্রে বিপদ ডেকে আনে। গোটা পৃথিবীতে যখন যুদ্ধবাজদের রণবাদ্য বাজে তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে কথা বলা যায় না। অন্ধের সমাজে অন্ধ সেজে থাকতে হয়। এই কবিতার কথক তাই চাইলেন অন্ধের সমাজে একা চক্ষুস্মান না হয়ে অন্ধ হয়ে যেতে। লিখলেন—

> 'যেহেতু নিদানকালে চক্ষুলজ্জা ভয়াবহ, তাই–
>
> নিজের চক্ষুকে হয়তো নিজেরই নখরাঘাতে উপড়ে ফেলে দিয়ে
>
> অন্ধের সমাজে আজ মিশে যেতে হবে'।[১১]

পঞ্চাশের দশকের আর এক গুরুত্বপূর্ণ কবি শঙ্খ ঘোষ অন্ধত্বকে একইরকম প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন তাঁর 'অন্ধ বিলাপ' কবিতায়। কবিতার মুহূর্ত বইতে কবিতাটির লেখার ইতিহাস প্রসঙ্গে অন্ধত্বের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, বিহারের গান্ধিমাঠে পুলিশ নির্মমভাবে তেইশজন কৃষককে গুলি করে মারে। এরপর তাঁর মনে হয়েছে 'অন্ধ অন্ধ ইতিহাসকে যে দেখতে পায় না সে তো অন্ধ'। আর এই অন্ধত্বকে প্রকাশ করার জন্য তিনি মহাকাব্যের চরিত্র ধৃতরাষ্ট্রকে বেছে নিলেন, লিখলেন—

'অন্ধ আমি দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে

কাজেই কোথায় কী ঘটছে তা সবই আমায় জানতে হবে...

অন্ধ আমি, দেখতে পাই না, আমিই তবু রাজ্যশিরে

এবং লোকে বলে এ দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে

কারা এসব রটিয়ে বেড়ায় বলো আমায় হে সঞ্জয়

অন্ধ আমি, কিন্তু তবু এসব আমায় জানতে হবে

তেমন-তেমন তম্বি করলে বাঁচবে না একজনার পিঠও

জানিয়ে দিয়ো খুবই শক্ত বল্লাতে এই রাষ্ট্র ধৃত'। ১২

'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' (১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধ' কবিতায় অন্ধত্বকে তিনি অন্যমাত্রায় ব্যবহার করলেন, সাপের অনুষঙ্গে অন্ধত্ব প্রতিকায়িত হল। শেষের চরণে লিখলেন—

'ছোবল নিয়ে সে ঢুকেছে গহনে গহনে

অন্ধকে ছুঁয়ে বসে আছে অন্ধেরা'। [১৩]

কবি অরুণ মিত্র 'ঘনিষ্ঠ তাপ' (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থে অন্ধত্বকে প্রতীক অর্থে ব্যবহার করেছেন—

'একলা টিমটিমে লণ্ঠন

অন্ধের মতো হাতড়ায়

পথগুলো যেন থমকে গিয়েছে'।[১৪]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি কীরকমভাবে যে বেঁচে আছি'(১৩৭২বঙ্গাব্দ)-এর অতি জনপ্রিয় কবিতা 'দেখা হবে' যেখানে লিখেছেন— 'ভ্রু পল্লবে ডাক ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে', এই কবিতার একটু পরে লিখলেন 'প্রথম যৌবনে আমি অনেক ঘুরেছি অন্ধ, শিমূলে জারুলে' অর্থাৎ এখানে অন্ধত্ব এক ধরণের যৌবনের ভ্রান্তিকে তুলে ধরে।

বাংলাদেশের কবি শামসুর রহমানের একটি কাব্যগ্রন্থের নাম ' যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে' (১৯৮৪)। এই কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতায় অন্ধ নারীর একটি বাক প্রতিমা তিনি নির্মাণ করেন—

'যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে। আজও মনে পড়ে :

যে অন্ধ সুন্দরী কাঁদে রাত্রিদিন আমার নিঝুম

বুকের কন্দরে একাকিনী

তাকে চিনি বলে মনে হয়। অনিন্দ্য কুসুম ঝরে

তার চুলে মধ্যরাতে, সকল সময়

হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে থাকে চুপচাপ, হাতে

গালের মসৃণ ত্বকে তার সুস্পষ্ট কান্নার ছাপ' ।[১৫]

কবিতাটি এক বিষণ্ণতার কবিতা। মনের মধ্যে একটি অন্ধ নারীর বিষণ্ণ চিত্র এঁকে দেয়। অন্ধ নারীর প্রাসঙ্গিক অনুষঙ্গ বারবার এসে পরে এই কবিতায়—

'সে অন্ধ সুন্দরী

ব্যথিত বন্দিনী আজ। তার পায়ে কোনো

প্রাচীন নূপুর নয়, লোহার শেকল বাজে প্রহরে প্রহরে

প্রতিষ্ঠিত অন্ধকারে। কোনোদিন কোনো

দৃশ্য তার চোখে পড়বে না, এ সহজ সত্যটুকু

সে নিয়েছে মেনে। কারা তা খুব কাছে

পাকায় জটিল ঘোঁট, ফাঁদ পাতে আর

অকস্মাৎ খাপ থেকে খোলে তরবারি

নিঃশব্দে, এবং করে তাক

গোপন বন্দুক, সে দেখতে পাবে না কখনো কিছু।

অবশ্য হঠাৎ সে চমকে ওঠে কোনো কোনো শব্দ শুনে,

হাতড়ে বেড়ায়

নিজেরই বিষণ্ন ছায়া। কোথাও ইঁদুর আর ছুঁচো

পুরনো মাটির স্বাদে করে ছোটাছুটি,

হয়তো বা বাদুড় ঝুলে থাকে-ঘুণেখাওয়া কড়িকাঠে;

সে চমকে ওঠে

নিজের পায়ের শেকলের

ঈষৎ ঝংকারে বারে বারে’।[১৬]

হাংরি জেনেরেশন কবিদের মধ্যে অন্যতম সমীরণ ঘোষ, তাঁর একটি কবিতা ‘এখনি,অন্ধ,—’। এখানে অন্ধত্বকে প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। অন্ধত্ব এখানে স্টেশানের ভিখারির রূপে প্রতীকায়িত, লিখেছেন—

‘এক হাতে লাঠি আর

অন্য হাতে চক্র, আমি আজ অন্ধ তাই, কখনো আমার হাত

ভরে ওঠে না আয়ুধ ও প্রতীকী বস্তুসমূহে’—[১৭]

এই অন্ধবিলাপ নানা অনুমান করতে করতে চলেছে নানা চিত্রকল্প নির্মাণ করতে করতে, তাঁর চক্ষুস্মান দিনের স্মৃতি বারবার ফিরেফিরে আসে এই কবিতায়, লেখেন—

‘আমি কিন্তু আজ অন্ধ। এবং খঞ্জও বটে।

… কনিকা ছিঃ এখন রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়

আমি অন্ধ, আমার সঙ্গীত লালন-গীত'।

আসলে আধুনিক যুগের কবিতার ধর্ম হল, ব্যক্তিগত অনুভুতিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া। তাই যে অন্ধত্ব ছিল তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়, সেই অন্ধত্ব ধীরে ধীরে কবির নিজের অনুভূতির মধ্যে সংক্রমিত হয়েছে। যেমন শৈলেশ্বর ঘোষের 'অন্ধ আমি' কবিতায়, যেখানে কবি লিখছেন—

'আমিই অন্ধ আমিই অন্ধকার

চোরবাজারে হাতবদল একদা লুঠের মাল

আমি নেশা যৌনতার ভাষা—দুই শরিকের

জমির মাঝে তুলে ধরা আল,' [১৮]

'আমিই অন্ধ আমি অন্ধকার' এই গতের মধ্যে তিনি দীর্ঘ কবিতাটি লিখেছেন। শেষের স্তবকে এসে সেই অন্ধত্বকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

'ভাষাহীন সূর্যাস্ত—সাতসমুদ্র আমি

সাধনার দুই চোখে নষ্ট পটভূমি

জল নই বাতাস নই সময়ের স্বেচ্ছাচার

প্রকৃতির শরীর জুড়ে খেলা তামাশার

অন্ধ আমি—হাজার চোখে চ্ছল চ্ছল অন্ধকার'।[১৯]

তথ্যসূত্র

১. ব্যতিক্রমধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপক সারাওয়াতারা জামান। ২০১৪। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৮৮ ।

২. অদ্ভুত আঁধার এক। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। নিউ স্ক্রিপ্ট। পৃষ্ঠা ১৩০।

৩. বেদ। রমেশচন্দ্র দত্ত। ১-৫ খণ্ড। হরফ প্রকাশনী।

৪. বাল্মীকি রামায়ণ। রাজশেখর বসু। নবযুগ প্রকাশনী। ২০০৮

৫. আমাদের মহাভারত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স।

৬. মহাভারত। কালীপ্রসন্ন সিংহ। তুলি কলম।

৭. ব্যতিক্রমধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপক সারাওয়াতারা জামান। ২০১৪।

৮. গান্ধারীর প্রার্থনা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯. ঐ

১০. সুকুমার রচনাবলী।

১১. শ্রেষ্ঠ কবিতা। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দে'জ।

১২. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ

১৩. ঐ

১৪. অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ।

১৫. শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩

১৬. ঐ

১৭. হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন। সম্পা- সমীর চৌধুরী। কথা ও কাহিনি। কোল-৭৩। ১৯৯৮।

১৮. ঐ

১৯. ঐ

বাংলা কথাসাহিত্যে দৃষ্টিহীন অন্যতর সক্ষমদের প্রসঙ্গ ও পরিণতি

কাকে বলে দৃষ্টিহীন? আমরা বাংলা ভাষায় কিছু নেতিবাচক শব্দ দিয়ে তাদের চিহ্নিত করেছি, কখনো তাদের বলেছি অন্ধ, কখনো বলেছি কানা। এইভাবে আমরা দৃষ্টিহীনদের আলাদা করেছি, অবজ্ঞা করেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জন সংখ্যার প্রায় দশ শতাংশ দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। ভারতের জন সংখ্যার প্রায় ১.৪৯ % মানুষ দৃষ্টিহীন।

একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির দৃষ্টিসক্ষমতা (ভিসুয়াল অ্যাকুইটি) ২০/২০০ বেশি হয় না। অর্থাৎ একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি ২০০ ফুট দূর থেকে যা স্পষ্ট দেখতে পান, একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি তা ২০ ফুট দূর থেকে দেখতে হবে। সে জন্য বারাগা(১৯৮০) এই ভিসুয়াল অ্যাকুইটি কে দৃষ্টিহীনতা পরিমাপের একক মনে করেন নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দুই ভাগে ভাগ করেছে – দৃষ্টিহীন ও আংশিক দৃষ্টিমান। যারা দৃষ্টিহীন তাদের আবার 'সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন' ও 'প্রায় দৃষ্টিহীন' পর্যায়ে ভাগ করা হয়। 'প্রায় দৃষ্টিহীনরা' আলোর তারতম্য করতে পারে। আংশিক দৃষ্টিহীনরা খুবই সামান্য দেখতে পায়। [১]

কথা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের প্রসঙ্গ বারে বারে এবং সবচেয়ে বেশি এসেছে। অন্ধ লেখক হিসেবে হেলেন কেলারের কথা সকলের পরিচিত। এমনকি বিখ্যাত ঔপন্যাসিক জেমস জয়েসের চোখের সমস্যার কথা জানা যায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে বহু উপন্যাস ও

ছোট গল্প লেখা হয়েছে যেখানে প্রধান চরিত্র হিসেবে দৃষ্টিহীন কোনও মানুষের জীবন কথাকে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে অতি জনপ্রিয় কয়েকটি উপন্যাসের কথা বলতে পারি। ২০১১ সালে প্রকাশিত জনাথন অক্সিয়েরের এর উপন্যাস ‘পিটার নিম্বলে অ্যান্ড হিস ফ্যান্টাস্টিক আইস’ ; যেখানে পিটার নামে এক অন্ধ চোরের গল্প আছে। এই পিটার একদিন এক পর্যটকের থেকে চুরি করে একটি ম্যাজিক বাক্স পায়, যার মধ্যে ছিল তিনটি চোখ। যে চোখগুলো এক অন্য জগতের দরজা খুলে দিয়েছিল তার জীবনে। ২০০2 সালে প্রকাশিত হয় জনপ্রিয় উপন্যাস আন্দ্রে ক্লিমেন্তসের ‘ থিংস নট সিন’। আত্মজৈবনিক এই উপন্যাসটি রবার্ট ফিলিপের অন্ধ জীবনের গল্প। ফিলিপ বা ববি একদিন সকালে অনুভব করে সে কিছুই আর দেখতে পায় না। ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় লুসি মে লেনক্স এর উপন্যাস ‘লাভ ইন টাচ’। যেখানে ক্যাসি নামের মেয়েটি বাবার মৃত্যুর পর বধিরদের ভাষা শিখতে গিয়ে আলাপ হয় জন্মান্ধ ও বোবা একটি মিষ্টি যুবকের সঙ্গে। এবং এই আলাপ তাকে এক অন্য অনুভূতির জগতে পৌঁছে দেয়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল বেভারলি বাটলারের উপন্যাস ‘ লাইট আ সিঙ্গেল ক্যন্ডেল’। এই উপন্যাসটি তরুণ প্রজন্মকে আকর্ষিত করেছিল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ক্যাথি নামের একটি মেয়ে যে গ্লুকমার অসুখে দৃষ্টিশক্তি হারায় ১৪ বছর বয়সে। এবং এর স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম দৃষ্টিহীন অন্যতর সক্ষম চরিত্রের দেখা পাওয়া গেছে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রজনী’(১৮৭৭) উপন্যাস থেকে। উপন্যাসটি রজনীর আত্মজবানিতে কথিত।

সুতরাং জন্মান্ধ জীবনের নানা সুখদুঃখের অনুভূতি আমারা তার মুখে পাই। উপন্যাসের শুরুতে তার আত্মকথন হল—

'আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব;...আমি জন্মান্ধ'। [২]

সেকালের সমাজের চোখে অন্ধের অবস্থানটি এই ভাবে চিত্রিত—'পুরুষই হই, মেয়েই হই,অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কানা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না'। অন্ধ হলেও রজনী কর্মক্ষম ছিল। কোলকাতার রাস্তায় তার চলার ক্ষমতা ছিল। সে বলেছে—

'অন্ধ হই যাই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্বত্র যাইতে পারিতাম, কখনও গাড়ি ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই অনেকবার পদচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, 'আ মলো ! দেখতে পাসনে? কাণা নাকি?' [৩]

এই রজনী বড়লোকের বাড়িতে ফুল বেচতে যায়। বড়বাড়ির মেয়ে লবঙ্গলতা তাঁকে 'কাণী', কাণী ফুলওয়ালী' বলে দাকে। রজনীর তাতে কষ্ট হয়, সে বলে, 'কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত'। এই বড়বাড়িতে ফুল দিতে গিয়ে সে ছোটবাবুর স্পর্শ পেয়ে তার মনে প্রেম জাগে। রজনী ফুলের স্পর্শের সঙ্গে মানুষের স্পর্শের তুলনা করেছে—' সেই স্পর্শ পুষ্পময়।... আ মরি মরি ! কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল'। এই ছোটবাবু রজনীর চোখ পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিল তার জন্মান্ধ সারবে না।

জন্মান্ধ নারীর সুযোগ নিতে চেয়েছিল এই উপন্যাসের খল চরিত্র হীরালাল। মদ্যপ হীরালাল রজনীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু রজনী রাজি না হওয়ায় তাকে নদীর ধারে এক নির্জন দ্বীপে ফেলে রেখে চলে যায় হীরালাল। অসহায় রজনী আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই উপন্যাসের একটি সুখী সুখী সমাপ্তি আছে। জন্মান্ধ রজনী কিভাবে চোখ পেল তা বিজ্ঞানসুলভ নয়, উপন্যাসের কাহিনির প্রয়োজনে বিজ্ঞানকে পাশে ঠেলে রজনীর দৃষ্টি ফেরানো হয়েছে, বাড়ি জমিদারি সবই হয়েছে। শুধু গল্পটি বিশ্বাস যোগ্য হয়নি।

অনুরূপা দেবীর(১৮৮২-১৯৫৮) 'মহানিশা' (১৯১৯) উপন্যাসটিও অন্ধ নারী ধীরার জীবনকথা। ধীরা বড়লোকের মেয়ে। শুধু অন্ধত্বের কারণে তার মধ্যে মানসিক অবসাদ নেমে এসেছিল। অথচ বিয়ের আগে ও পরে স্বামীর ভালোবাসা পেয়েছিল যথেষ্ট। স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া সত্বেও তার মধ্যে হীনমন্যতার জন্ম হয়েছিল। তার মনে হতে থাকে স্বামীকে সে বঞ্চনা করছে। এই বোধ থেকে ধীরার স্বামী নির্মলের মধ্যেও জন্ম নেয় অতৃপ্তি আর তার ফলে সে আকৃষ্ট হয় অপর্ণার প্রতি। স্বামীর অসুখী জীবনের দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে ধীরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

অচিন্ত্যকুমার সেঙ্গুপ্তের লেখা 'তৃতীয় নয়ন' উপন্যাসে রয়েছে কবি শিল্পী এক চরিত্রের অন্ধত্বের হাহাকার। উপন্যাসের চরিত্র মিহিরের অন্ধত্ব হঠাৎ করে নেমে

এসেছিল। সাধারণত গ্লুকোমা রোগের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উপন্যাসের শুরুতে মিহির স্বপ্নে দেখতে পায়—

‘যেন চারদিক ভীষণ সাদা হয়ে গেছে, কঠিন সাদা, উলঙ্গ সাদা—চেয়ে থাকতে থাকতে চোখের দৃষ্টি যেন যন্ত্রণায় ওঠে হাহাকার ক’রে, ... দুই চোখে এতো সাদা যেন সহ্য করা যায় না, দুই হাতে বহন করা যায় না শূন্যতার এতো ভার। রুক্ষ, ক্ষুধার্ত সাদায় মিহিরের দুই চক্ষু যেন শুকিয়ে গেলো’।[৪]

এই ভাবে একদিন সকাল বেলা মিহিরের দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। কাফকার লেখা মেটামরফোসিস গল্পের মতো। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে রায় দিয়েছে এই রোগ সারবে না। ডাক্তার এই রোগটিকে বলেন ‘detachment of retina’ । শিল্পী মিহির অস্তিত্বের সংকটে পড়ে। প্রেমিকা মিনতি তার সাহচর্য করতে চায়। নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করে মিহির বলে—

‘আমি আজ একেবারে মুক্ত,-- বুঝবেনা তুমি আমার এই মুক্তির তীব্রতা।...এই অন্ধতা, এই ব্যর্থতাই তো আমার প্রকাণ্ড শিল্প সৃষ্টি’।[৫]

কিন্তু মিনতির জীবনে তৃতীয় ব্যক্তি সীতশের প্রবেশ ঘটে। মিনতি সোমানন্দ নামে এক আধ্যাত্মিক গুরুকে ধরে মিহিরের চোখ সারিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সোমানন্দ লৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস রাখতে বলে। সমাজের চোখে দৃষ্টিহীন মানুষের অবস্থা কেমন তা ধরা পড়েছে সীতেশের বক্তব্যে—

‘ বেচারা অন্ধ হয়েছিল বলেই যা-একটু দয়া মায়ার আশা করতে পারে, কিন্তু যদি কালা হ’তো—

ভাবো দিকি একবার,... তখন তুমি না হেসে থাকতে পারতে না’। [৬]

অন্ধত্বের কারণে মিহিরের প্রেম বারবার সিতেশের ব্যঙ্গের কশাঘাতে ছিন্ন হয়েছে। আর একদিকে দৃষ্টিহীন ও অন্যদিকে চক্ষুস্মান দুই পুরুষের মাঝে পড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে মিনতি। আসলে সোমানন্দ চেয়েছিল মিনতি হয়ে উঠুক হিহিরের তৃতীয় নয়ন। তার চোখ দিয়ে সে জগতের রূপ রস আস্বাদন করুক। উপন্যাসটি তেমনি একটি ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয়েছে।

বিমল করের ‘পূর্ণ অপূর্ণ’ (১৩৭৯) উপন্যাসে রয়েছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী নির্মলার কথা। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র হয়েও তার অন্ধত্ব এই উপন্যাসের নায়ক সন্যাসী সুরেশ্বরের জীবনে পূর্ণতা এনেছে। সুরেশ্বর তৈরি করেছে অন্ধ আশ্রম। যেখানে সে সেবার কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে। নির্মলা তার একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে বলেছে— ‘আমার চোখ দুটোই কি আমি?...আমার এই হাত দুটো, কিংবা শুধু এই মুখ, এই চোখ যদি আমি হই, তবে সে আমি কিছুই না’। নির্মলা তার অপূর্ণতা থাকা সত্বেও সুরেশ্বরকে পূর্ণতার স্বাদ দিয়েছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের(১৯১১-৮৬) লেখা ‘লালু ভুলু’ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল এই উপন্যাসের দুই চরিত্রের জন্য। লালু ও ভুলু। এদের মধ্যে লালু খোঁড়া, ভুলু অন্ধ। ‘ খোঁড়া

লালু বাজায় মাউথ অর্গান, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার সুর মিলিয়ে শিশ দেয় অন্ধ ভুলু'। এই ভাবে তারা শিয়ালদহ স্টেশনের আশে পাশে রোজগার করে বেড়ায়। আর এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় বড়লোকের সন্তান সুরজিতের।

ভুলু চিরকাল অন্ধ ছিল না। পূর্ববঙ্গে তাদের বাড়ি ছিল। আট বছর বয়স থেকে সে একটু একটু দৃষ্টি কমে যেতে থাকে। গরীব স্কুল মাস্টার বাবা ছেলের চিকিৎসা করতে পারেননি। আলোপ্যাথি চিকিৎসা শুরু হওয়ার মুখে দেশভাগের অস্থিরতায় বাস্তুত্যাগী হয়ে কোলকাতায় পৌঁছায়। কোলকাতায় পৌঁছে সে বুঝতে পারে চোখে সে আর একেবারেই দেখতে পারে না। এই কোলকাতায় তার সঙ্গে আলাপ হয় ডান পা কাটা লালুর সঙ্গে। লালুরও জীবনে একদিন বাবা া সব ছিল, কিন্তু বাবার এক্সিডেন্টে মৃত্যু ও মায়ের যক্ষ্মায় মৃত্যুর পর সে একা হয়ে যায় পৃথিবীতে। অথচ দুজনের স্কুল দেখলে ভেতরে পড়াশুনার বাসনা জেগে ওঠে। বই দোকান থেকে বই কিনে লালু পড়ে, ভুলু শোনে। পড়ালেখার বাসনা পেয়ে বসে লালুর মধ্যে। আর তাই ভুলু একাই গান গেয়ে রোজগার করে বন্ধুর সাহায্যের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের এই পেশাকে তারা ভিক্ষে বলে মনে করে না কিছুতে। আর ভুলুর এই গানের মিষ্টি গলার জন্যে গ্রামাফোন কোম্পানির সুধাংশুবাবু তাকে গান করার কন্ট্রাক্ট দেয়। কিন্তু ঘটনা চক্রে দুই বন্ধুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। ভুলু নীরবে ও গোপনে তার বন্ধুকে সাহায্য করতে থাকে। এই সব উত্থান পতনের মিষ্টি কাহিনি লালু ভুলু গল্পে রয়েছে। একটি অন্ধ ছেলের নীরব আত্মত্যাগের গল্প। উপন্যাসের নাম লালু ভুলু হলেও ভুলুর চরিত্রটি বেশি উজ্জ্বল রঙে এঁকেছেন লেখক। [৭]

আরও কয়েকজন দৃষ্টিহীন চরিত্র বাংলা কথা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, যেমন বিমল করের লেখা 'শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন' (১৯৭১); কিন্নর রায়ের 'নিরপেক্ষ'(১৯৯৪)। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলাই যে কেরোসিন ডিলার। সে বসে বসে পরিবর্তমান জগত সংসারকে অনুভব করতে পারে।

২০১৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে সমীর রক্ষিতের উপন্যাস ' অন্ধ জন্মান্ধের কথা অথবা একটি প্রেমের উপাখ্যান'। এই উপন্যাসের নায়ক পবন। সে জন্মান্ধ নয়। জীবনের বছর দশেক সে পৃথিবীর আলো দেখেছিল। তার বাবা পরান কেলভিনটন জুট মিলের কর্মী ছিল। মা মালতীর সঙ্গে তার সুখদুঃখে শৈশবের দিনগুলো কাটছিল। তাদের কলোনিতে এক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভিখারি আসতো, সবাই বলত খ্যাপা বৈরাগী। তার কাছে গান শিখেছিল পবন। আমরা দেখব অন্ধ হবার পর পবনের পরিণতি হয়েছিল এই খ্যাপা বৈরাগীর মতো। জুটমিলের গুণ্ডাদের আক্রমণে পবন দৃষ্টিশক্তি হারায়। তার চিকিৎসার দায়িত্ব বর্তায় ডাক্তার গীতা মল্লিকের উপর। আর তার সবসময়ের সঙ্গী ফুলিয়া পবনকে ভালো রাখতে চায়। মা মালতীর মুখে সে শোনে জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গল্প। এরপর সে খ্যাপা বৈরাগীর রেখে যাওয়া ঝুপড়ি, হারমোনিয়াম নিয়ে আর একটা খ্যাপা বৈরাগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আবর্তন কোনও ইতিবাচক বার্তা আনেনি বলেই মনে হয়। দৃষ্টিহীন মানুষের এই পরিণতি নেতিবাচক উদ্দেশ্যহীন জীবন দর্শনের কথা বলে। যেটা কাম্য নয়।

ছোটোগল্প :

বাংলা ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথই প্রথম দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী চরিত্র এঁকেছেন 'দৃষ্টিদান' গল্পে। এই গল্পের চরিত্র কুমু। শারীরিক অসুস্থতার কারণে তার চোখের অসুখের শুরু। কুমুর স্বামী অবিনাশের ভুল চিকিৎসায় তার চোখের দৃষ্টি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায়। তবু স্বামীর প্রতি তার ক্ষোভ ছিল না কোনো। শুধু ইশ্বরের কাছে তার প্রার্থনা ছিল এই—'মা ত্রিনয়নী আমার দুই চক্ষু লইলেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না'। এমনকি স্বামী তার কৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা করলে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসার প্রকাশ হয়েছে এই বক্তব্যে—

'বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিস তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে কী সান্ত্বনা থাকিত'।

অথচ এই অবিনাশ ধীরে ধীরে অন্য নারীতে আসক্ত হয়ে ওঠে। কুমু এর কারণ জানতে চাইলে অবিনাশ বলে—

' সত্যিই বলিতেছি আমি তোমাকে ভয় করি, তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সেখানে আমার প্রবেশ করিবার জো নাই। তুমি আমার দেবতা, দেবতার ন্যায় ভয়ানক তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য করিতে পারি না...'।

কুমু তার দৃষ্টিহীন জীবন নিয়েও শব্দ গন্ধ স্পর্শের মাধ্যমে আবার নতুন জীবন শুরু করে। স্বামীকে নতুন করে ফিরে পায় কুমু। স্বামীকে চোখে দেখতে না পেয়ে তার মধ্যে

যে টুকু একাকীত্ব যেটুকু শূন্যতা জাগে তা সে কাটিয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। রবীন্দ্রনাথ হয়তো এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে একজন দৃষ্টিপ্রতিস্পর্ধী মানুষ কীভাবে নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে সেই পাঠ।

সীতা দেবী(১৮৯৫-১৯৭৭) রচিত 'আলোর আড়াল' গল্পটি দৃষ্টিদান গল্পের ঠিক বিপরীত যেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র জমিদার ধরণীমোহন। তিনি রূপবান কিন্তু দৃষ্টিহীন। এমন পাত্রের জন্য পাত্রী মিলল কুৎসিত মলিনা। স্বামীকে দেখে মলিনার মনে হয়েছে—

'বিধাতা তাঁকে দৃষ্টিহীন করেছেন আর আমাকে করেছেন রূপহীন; কাজেই চোখের দেখার সম্বন্ধ, চোখে দেখার আনন্দ , আমাদের জীবনে ঘটবে না; কিন্তু দৃশ্য জগৎ ছাড়াও যে আর এক জগৎ আছে, তার যত আনন্দ সব আমি তাকে দেব—দৃশ্য জগতকে আমি তাঁর হয়ে দেখব আমার ভিত্র দিয়ে তিনি নিজের হারানো দৃষ্টি ফিরে পাবেন'।

এই ভাবে ধরণীমোহন নতুন করে জীবনের আনন্দ ফিরে পেলেন। ধরণীমোহনের বিশ্বাস ছিল মলিনা কুৎসিত নয়, আর এই বোধ মলিনাকে অপরাধবোধে আচ্ছন্ন করল। কিন্তু অপারেশনের পর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়ে ভুল ভাঙলো ধরণীমোহনের। স্বামীর কাছে প্রত্যাখাত হয়ে মলিনা দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আশ্রমে প্রতিবন্ধীমানুষদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করল। ঘটনা পরম্পরায় ভুল ওষুধ প্রয়োগের ফলে ধরণীমোহন আবার দৃষ্টি

হারালেন। এবং মলিনার আশ্রমে হাজির হলেন। ধরণীমোহনের মনের দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। তিনি অনুভব করলেন অন্তরের অমলিন সৌন্দর্যকে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৮-১৯৭১) 'তমসা' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। এই গল্পের চরিত্র পঞ্খী, সে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। তার অন্যতর সক্ষমতা প্রকাশিত হয় তার হরবোলায়, গান, বাজনায়। স্টেশনে বসে সে ডুবকি বাজিয়ে গান করে। কিন্তু সমাজের সুস্থ মানুষের চোখে সে অবহেলিত, অপমানিত। স্টেশনের দোকানদারেরা 'শুয়ার', 'কানা' বলে ডাকে। পঞ্খী সেসবে পাত্তা দেয় না, আপন মনে গান করে, কথা বলে। ' চোখে ছটা লাগল তোমার আয়না বসা চুড়িতে'—তার গাওয়া গান শুনে খেমটা নাচের দলের একটি মেয়ে মুগ্ধ হয়। পঞ্খী শিল্পী মানুষ, সে গান শুনতে ও শোনাতে ভালোবাসে। শিল্পী সুলভ মন আছে বলেই সে খেমটা দলের মেয়েটিকে গান শোনাতে বলে। মেয়েটি যখন তাকে 'কালা তোর তরে কদম তলায়' গানটি গেয়ে শোনায় তখন—'পঞ্খীর সর্বাঙ্গ যেন অসার হয়ে গিয়েছে'। শিল্পীর অনুভূতি থেকে সে মেয়েটিকে প্রণাম করেছে। তার চোখের জলে মেয়েটির পায়ের আলতা পঞ্খীর চোখে মুখে নাকে কপালে লেগে লাল হয়ে গেছে।

পঞ্খীর অনেকরকম সক্ষমতা আছে। সে একা একা পথ চলতে পারে। সে তার ছোটবেলার প্রসঙ্গে বলে—' কানা বলে মা হেনস্থা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম'। তার বাবা কৃত্তিবাস অন্ধ অপরিণত ছেলের চিঁচিঁ চিৎকার শুনে নাম রাখেন পঞ্খী। সুতরাং পরিবারের নিকটজনের কাছে এই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের যে কোনো গুরুত্ব ছিল না তা বোঝা যায়। পঞ্খীর ঘ্রাণ শক্তি ও স্পর্শ শক্তির প্রখরতার পরিচয় বারবার পাওয়া গেছে

এই গল্পে। তার অনুভূতির কথা বলতে গিয়ে লেখক লিখেছেন—‘ ওর সাদা ছানিপড়া চোখে আলোকশিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে’।

আবেগ সর্বস্ব শিল্পীর পরিণতি এই গল্পে সার্থকতা পায়নি। গানের দলের টানে পঞ্চী জংশন স্টেশনে উপস্থিত হয়। নতুন জায়গার পথঘাট নিজে নিজে সে চিনে নেয়। ডুবকি বাজিয়ে ‘কালা তোর তরে কদম তলায়’ গান গেয়ে সে লোক জড়ো করে। ঝুমুর দলের যে মেয়েটিরকে সে ঠাকরুন বলে ডাকত তার স্মৃতি নিয়েই সে জীবন পার করে দেয়। তার জীবনের পরিণতি হয় তীর্থক্ষেত্রের পথের ধারে বসে ভিক্ষাজীবীর পেশায়। পাশ দিয়ে ঠাকরুন চলে গেলেও সে অন্ধ পঞ্চীকে চিনতে পারে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেশ কিছু গল্পে দৃষ্টিহীন চরিত্রের প্রসঙ্গ এসেছে, যেমন ‘অন্ধ’, ‘আততায়ী’, ‘ অন্ধ ও ধাধাঁ’, ‘অন্ধের বউ’ প্রভৃতি গল্পে। ‘অন্ধ’ গল্পে সনাতন চক্রবর্তী নেশা করে করে অন্ধত্বকে নিজে ডেকে এনেছে। ‘অন্ধ হওয়ার ভয় থাকা সত্বেও মদ যে সে গিলিত সে তো নিজের জন্য’। আসলে এক নেতি জীবনের দর্শনকে বোধহয় অন্ধত্ব বলে মনে করেছেন লেখক।

‘আততায়ী’ গল্পের মূল বিষয় দুই বন্ধু কৃত্তিবাস ও দিবাকরের পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র কৃত্তিবাসের চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তার বাবা ধনদাসের মারের আঘাতে। বড় হয়ে পরে দিবাকর হয় চোখের ডাক্তার , আর কৃত্তিবাস জেনারেল ফিজিসিয়ান। একসঙ্গে থাকতে শুরু করে তারা। কৃত্তিবাস বিয়ে করে

আনে মহামায়াকে। দিবাকর ইচ্ছে করেই কৃত্তিবাসের ভালো চোখটির অপারেশন করার নামে ক্ষতি করে দেয়, অন্ধ হয়ে যায় কৃত্তিবাস। তারপর একদিন দিবাকর ও মহামায়ার ঘনিষ্ঠ অবস্থার কথাবার্তা শুনতে পেয়ে চলে যায় সবকিছু ছেড়ে—

' অন্ধ মানুষের একা এ জগতে বিচরণ করা সম্ভব নয় টের পাইয়া একা বাহির হইয়া যাওয়ার বদলে শধু সঙ্গে নিল চাকরটাকে'।[৮]

' অন্ধের বউ' গল্পের শুরুতে রয়েছে—'বিবাহের এক বছর পরে ধীরাজ অন্ধ হইয়া গেল। চোখের একটা অসুখ আছে, বড়ো বিপজ্জনক অসুখ, চোখের ভিতরে চাপ যাতে বাড়িয়া যায়'। বিবাহ বার্ষিকীর পরের দিন অন্ধ হল ধীরাজ। আগের রাতে অনেক দেরীতে ঘুমিয়েছিল। আর এজন্য ধীরাজের স্ত্রী সুনয়না নিজেকে ধীরাজের এই অন্ধত্বের জন্য দায়ী করে—

' আমি তোমার চোখ নষ্ট করেছি—স্বামীর চোখ খাকি হতভাগী আমি,আমার মরণ নেই। আমিও অন্ধ হয়ে যাব—নিজের চোখ উপড়ে ফেলব'।[৯] একজন মানুষ হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেলে বাড়ির লোকজন, পাড়ার লোকজনের মধ্যে কি কি পরিবর্তন আসতে পারে এই গল্পটি আমাদের দেখিয়ে দেয়। আসলে দৃষ্টিহীনদের সমাজ সংসার কেমন অসহায় মনে করে, দয়ার পাত্র মনে করে এই গল্পটি তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০)-এর 'চোখ গেল' গল্পটি আসলে ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। অপরাজিতা কাকে তার জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে তাই নিয়ে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত।

কিংশুক ও হিরণ্ময় দুজনেই অপরাজিতার পাণিপ্রার্থী। কিংশুক বিবাহিত কিন্তু স্ত্রী বিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে হিরণ্ময় দৃষ্টিহীন, তার চোখদুটি পাথরের। 'হিরন্ময়ের জুট আর কিংশুকের আয়রন, শেয়ারের দামের হিসাব নিলে কাউকে কারও চেয়ে কম মহৎ বলে মনে হবে না'। দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী হলেও হিরণ্ময় জীবনে সব দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত। 'একজনের চোখের মধ্যে এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ, আর একজনের মনের মধ্যে আর এক অন্ধকারের আঘাতের দাগ'। এইভাবে দুটি চরিত্রকে নির্মাণ করেছেন লেখক। হিরণ্ময়ের ভালোবাসা জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সমাজের কাছে অপরাজিতাকে নিন্দা শুনতে হয়। 'শুনতে পায় অপরাজিতা, ফরেস্ট অফিসারের স্ত্রী মন্ত্রণা তালুকদারও মামিমাকে কথা শোনাচ্ছেন— একজন অন্ধের হাতে এত সুন্দর মেয়েটাকে আপনারা তুলে দিলেন ?'[১০]

অপরাজিতার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না। কারণ—

'দুচোখ ভরা ঘৃণা নিয়ে হিরন্ময়ের চলন্ত চেহারাটার দিকে একবার তাকায় অপরাজিতা । পাথরের চোখের বুঝবার শক্তি নেই যে, এই বারান্দার বাতাসের মধ্যে অপরাজিতার স্নো-মাখা মুখটা সন্ধ্যাকেতকীর মতো নতুন শোভায় ঢলঢল করছে। অপরাজিতার পাউডার ছড়ানো গলা জড়িয়ে ঝিক ঝিক করে হাসছে ব্লাউজের জরি বসানোবর্ডার, দুলছে শ্যাম্পেনরং ভয়েলের আঁচল-, সোনার সরু চেনন-েকলেসের লকেট হয়ে বুকের উপর পড়ে রয়েছে হীরা বসানো ছোট একটি স্বস্তিকা । কিন্তু ঐ পাথরের চোখ মাঝে মাঝে তাকিয়ে অপরাজিতাও এই সুন্দর ও সাজানো রূপের ছবির উপর শুধু অন্ধকার ঢালছে।

ঐ মুখ থেকে জীবনে কখনো একথা শুনতে পাবে না অপরাজিতা, তুমি কত সুন্দর, আর এই সাজে তোমাকে মানিয়েছে কি সুন্দর'।

আর মনের এই শূন্যতার পথ দিয়ে নতুন করে প্রবেশ ঘটে কিংশুকের। হিরন্ময়ের অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে তারা ঘনিষ্ঠ হতে চায়। কিন্তু দৃষ্টিহীন হলেও হিরণ্ময়ের অনুভূতি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। তাই যে অন্ধ স্বামীকে মনে মনে ঘৃণা করত অপরাজিতা সেই স্বামীর অনুভূতির, ভালোবাসার বোধের কথা জেনে আবার সে হিরণ্ময়কে ভালোবাসে—

'যেন ঝড়ের বাতাসের ধাক্কা লেগেছে, তাই সোফার পাশ থেকে ছিটকে এসে একেবারে হিরন্ময়ের পাথুরে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় অপরাজিতা । পৃথিবীর মানুষ শুধু চোখ দিয়ে দেখে অপরাজিতাকে, আর এই লোকটা শব্দ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, আর ছোঁয়া দিয়ে দেখছে অপরাজিতার রূপ। প্রলাপ প্রলাপ'।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় বা বনফুলের দুটি গল্পে অন্ধত্বের কথা রয়েছে। একটি গল্প 'অন্ধ' ও অন্যটি 'অজান্তে'। 'অন্ধ' গল্পের মূল বিষয় মজার হলেও গভীর ব্যঞ্জনাময়। ইংরেজদের সম্পর্কে যে ধারণা আছে তারা খুব পরোপকারী সেই ধারনাকে বদলে দেয় এই গল্প। সদ্য পাস করা চোখের ডাক্তার ক্যাপ্টেন জোন্স ভারতে এসেছেন গরীব মানুষদের বিনা পয়সায় ছানি অপারশনের জন্য। জনৈক নেটিব ডাক্তারকে সে কথা ব্যক্ত করলে নেটিব ডাক্তার বুঝতে পারে সাহেবের অভিপ্রায়-'ব্যাটা হাত পাকাবার মতলবে আছে'।[১১]

সুতরাং চোখের সমস্যায় ভুগছে এমন রোগী খোঁজা শুরু হল। পুলিশ দিয়ে ধরে আনা হল চোখের সমস্যাযুক্ত রোগীকে। প্রচুর রোগী পাওয়া গেল। কিন্তু কেউ চিকিৎসা করতে

চায় না। কারণ গুজব রটেছে যে অপারেশনের নামে মানুষ মেরে ব্রিজের তলায় পুঁতে দিয়ে ব্রিজের ভিত শক্ত করা হবে। নেটিব ডাক্তারটি এই ভিড়ের ভেতর থেকে কয়েকটি ক্যাটারাক্ট রোগীকে আলাদা করে রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধ যার দুচোখেই ছানি। তাকেই পাঠানো হল সাহেবের সঙ্গে সদর হাসপাতালে। সাহেব চললেন ট্রেনের প্রথম শ্রেণিতে, মোটরকারে। বুড়ো অন্ধ ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণি ও পরে পায়ে হেঁটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুড়ো পালিয়ে আসে। কিন্তু ট্রেন না থাকায় বুড়ো সারা রাস্তা ছেলের কাঁধে চেপে পালিয়ে আসে।

'অজান্তে' গল্পে রয়েছে আমরা রাস্তা ঘাটে দৃষ্টিহীন মানুষদের সঙ্গে যে খারাপ আচরণ করি তার প্রতি একটি বার্তা। গল্পের কথক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফেরার পথে গলির অন্ধকারে এক ব্যক্তির সঙ্গে ধাক্কা লেগে পরে যান। রাগে কথক এক লাথি মারেন জনৈক পথচারীকে। কিন্তু পরক্ষণে জানতে পারেন বেচারা অন্ধ ভিখারি—'তার দিকে চেয়ে দেখি মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে—গরম কাদা। আর আমার দিকে কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোর করে আছে'।

কথা সাহিত্যিক সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) 'অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন' গল্পের মূল বিষয় হল দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শ্রীবিলাসের একদিনের বর্ণনা। দৃষ্টিহীনতার কারণে একজন মানুষের মধ্যে যে একাকীত্ব তৈরি হয়, যে শূন্যতা তৈরি হয় তার প্রকাশ বিভিন্ন আসক্তির জন্ম দেয়। শ্রীবিলাসেরর ক্ষেত্রে সেটা কামতৃষ্ণায় পর্যবসিত। আর এই কারণে তার রোজগেরে স্ত্রী বিন্দু সারাদিনের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে একদিনও রেহায় পায় না।

স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক কেবলমাত্র জৈবিক। তার একমাত্র সঙ্গী হাতের লাঠিখানা সেটা নিয়েই তার সারদিন কাটে। স্ত্রী রাত্রে বাড়ি ফিরে তাকে বলে— 'খড়ে শুয়ে আছে তিন ছেলে মেয়ে।... কিন্তু ওগো তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখের আগুন নেবাও, আমি তো আর পারিনে'। শ্রীবিলাস তবু স্ত্রীর আকুতিকে গ্রাহ্য করে না। তার যুক্তি হল— 'আমি অন্ধ মানুষ, কত দুঃখ। তার ওপর আমাকে আরও কষ্ট দিয়ে লাভ কী?' [১২] এই গল্পে একধরনের নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। অন্ধ মানুষের অসহায়তার থেকে বিকৃত মানসিকতা কিংবা নিজের অস্তিত্বের সংকটকে ভোলার জন্য জৈবিকতার আশ্রয় নেওয়ার এক মনস্তাত্বিক গল্প এটি।

ঠিক একই রকম একটি বিষয় রয়েছে সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮)' মহাযুদ্ধের পরে' গল্পে। যেখানে রয়েছে অন্ধত্বকে মনস্তাত্বিক ভঙ্গীতে প্রকাশ প্রচেষ্টা। যারা জন্মান্ধ এবং অবহেলিত তাদের জীবনের না পাওয়ার বেদনার কথা এই গল্পে ফুটে উঠেছে তিনজন জন্মান্ধ ভিখারিকে কেন্দ্র করে। এদের দুজন জন্মান্ধ ভিখারি বটা ও সুলা এবং একজন জন্মান্ধ ভিখারিনী কানি কুরচি। বটা ও সুলা বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের মানুষের মানসিকতাকে তুলে ধরেছে। কোথাও সুস্থতা নেই, সার্বিক হতাশা থেকে মানুষের আদিম তৃষ্ণা প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পুরানো একটি গোডাউনে আশ্রয় নিয়েছিল বটা ও সুলা। সেখানে ইঁদুর ও আরশোলার সঙ্গে সময় কাটায় দুজনে। এইখানে আসে আর এক অসহায় জন্মান্ধ নারী কানি কুরচি। দুই পুরুষের ভোগ্যবস্তু হয়ে যায় কুরচি। শুধু ভোগ নয়, নারীকে অধিকার করতে চায় দুই পুরুষ। আর এর ফলে শুরু হয়

সন্দেহ ও শত্রুতা। গোপনে একে অন্যকে গুপ্ত হত্যা করতে গিয়ে কাম্য নারীকেই তারা হত্যা করে ফেলে। আসলে এই গল্পে মানুষের জৈবিক চাহিদাকে দেখাতে চেয়েছেন লেখক। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অবক্ষয়ের বাস্তবতাকে প্রকট করেছে এই গল্প।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প ' কবি পত্নী' তে রয়েছে অন্ধ ও স্থবির কবি সুপ্রভাত দত্তের প্রসঙ্গ। কবিকে সংবর্ধনার জন্য যে সভার আয়োজন সেখানে তিনি যেতে পারেন নি প্রতিবন্ধকতার কারণে। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাঠিয়েছেন। স্ত্রীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়। দর্শকরা বরং চটকদার নাচ দেখতে ব্যাকুল। কিন্তু বাড়িতে এসে তাঁকে স্বামীর কাছে মিথ্যে বলতে হয়। তিনি মনে মনে খুশি হয়েছেন এই ভেবে যে স্বামীর অন্ধত্বের কারণে তিনি এসব দেখতে পাননি, দেখতে পেলে কষ্ট পেতেন।

উল্লেখপঞ্জী

১. ব্যতিক্রমধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপক সারাওয়াতারা জামান। ২০১৪। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। পৃষ্ঠা ১৯১।

২. বঙ্কিম উপন্যাস সমগ্র। পৃষ্ঠা ৩৮৮

৩. তদেব।

৪. অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী। চতুর্থ খণ্ড। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। গ্রন্থালয় । কোল- ৭৩। ১৩৬১। পৃষ্ঠা ১৯৮।

৫. ঐ। পৃষ্ঠা ২১৩।

৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৩৮।

৭.লালু ভুলু। নীহাররঞ্জন গুপ্ত। মিত্র ও ঘোষ। ১৩৭১।

৮. গল্প সমগ্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এস.বি.এস পাবলিকেশন। পৃষ্ঠা ৪৪৭

৯. ঐ। পৃষ্ঠা ৩৮৫

১০. গল্প সংগ্রহ। সুবোধ ঘোষ। প্রাইমা।

১১. গল্প সমগ্র। বনফুল ১ খণ্ড।পৃষ্ঠা ৪৬৩

১২. সোমেন চন্দ গল্প সংগ্রহ। পশ্চিম বঙ্গ বাংলা আকাদেমি। ১৯৯৭

বাংলা সাহিত্যে বুদ্ধিগত অন্যতর সক্ষম :

অবস্থান, পরিণতি

বাংলা কথাসাহিত্যে বুদ্ধি জড় অন্যতর সক্ষম চরিত্র : প্রসঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতা

প্রথমে আমাদের কিছু সাধারণ ধারণা সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। এমনিতে আমাদের সমাজে প্রতিবন্ধকতা নিয়ে নানান ভুল মানসিকতা আছে। বিভিন্ন ভাবে হেয় করা, অবহেলা করার প্রবণতা আছে। শারীরিক বা দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে তবু নানান বিকল্প উত্তরণ থাকে, কিন্তু মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা অত্যন্ত গভীর। ‘আমার সন্তান স্পেশাল চাইল্ড’ বইটির ভূমিকায় সম্পাদক লিখছেন—

> ‘ এই সব শিশুদের পাগল, মাথাখারাপ, পূর্বজন্মের দস/পাপ এ জাতীয় মন্তব্য বাবা-মায়ের প্রায়শই শুনতে হয়। ... এই দেশটির নাম ভারতবর্ষ। অথচ বড়ো দুর্ভাগ্যের বিষয় হল বাড়িতে, আত্মীয়-প্রিজন কিংবা সমাজের কাছে ভুল তথ্যটি পরিবেশিত হয়ে আসছে। সন্তানটি বিশেষ কিংবা জড়বুদ্ধি হওয়ার মূলে বাবা, মা কিংবা সন্তানটি কোনভাবে দায়ী নয়’।[১]

এই বাস্তব কথাটা আমদের ধূসর মস্তিস্কে প্রবেশ করতে চায় না কিছুতে। কাকে বলে মানসিক প্রতিবন্ধকতা? হার্বার(১৯৫৯)-এর মতানুযায়ী এটা এমন একটা অবস্থা, যাতে স্বাভাবিক বুদ্ধি দিয়ে যে কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায় তা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কম থাকে এবং

পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার জন্য যে আচরণগত দক্ষতার প্রয়োজন তার ধারাবাহিক ঘাটতি থাকে।[২]

বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা তিনভাগ মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী এবং প্রতি দশটি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার এই সমস্যার দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আক্রান্ত।[৩] অনেক ব্যাক্তি আছেন মনে করেন মানসিক প্রতিবন্ধীরা পাগল। কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ভুল। পাগলামি একটি মানসিক ব্যাধি। প্রতিবন্ধকতা বা অন্যতর সক্ষমতা একটি অবস্থা মাত্র।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাচীন গ্রিস ও রোম সাম্রাজ্যে এই ধরণের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের হত্যা করা, পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলা হত। কনফুসিয়াস ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলে এইসব বিশেষ সক্ষম মানুষরা সমাজে একটু একটু ভাগ্যপরিবর্তনের সুযোগ পেতে শুরু করেন। উনিশ শতকে এদের বলা হত 'idiot' বাঙ্গলায় বলা যায় বোকা। এদের শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য ১৮৪৪ সালে বই লেখেন সেগুইন। বইটির নাম—The Moral Treatment, Hygiene and Education of Idiot and Other Background Children'। ১৮৪১ সালে এইসব শিশুদের শিক্ষার জন্য আবাসিক স্কুল তৈরি করেন জোহান গুজেনবুল নামে এক সুইসারলান্ডের অধিবাসী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে জড়বুদ্ধির প্রসঙ্গ প্রথম পাওয়া যায় মহাভারতের জড়ভরতের কাহিনিতে। জড়ভরতের ভক্তির অংশটুকু বাদ দিলে যেটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাকে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বলেই মনে হয়। মহাভারত অনুবাদক কাশীরাম দাস লিখেছেন—

‘কোন কর্ম্ম নাহি করে, সদা হরি বলে।
হরিকথা বিনা মুখে অন্য না নিকলে।।
দেখি তার ভাই সব হইল দুঃখিত।
খাইতে না দেয় তারে, করয়ে উৎপাত।।
পোড়া অন্ন, ব্যঞ্জন সে খায় অবশেষ।
তাহা খেয়ে জপে হরি, নাহি দুঃখ লেশ।।
পোড়া অন্ন বিনা সেই ভাল নাহি পায়।
তাহা খেয়ে তুষ্ট হয়ে হরিগুণ গায়’।।[৪]

একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধীর সঙ্গে বাস্তবে এই রকম আচরণ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতে জড়বুদ্ধিদের সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া যায় গ্রিনের(১৮৫৬-৫৭) একটি লেখায়। যেখান থেকে জানা যায় জঙ্গল থেকে প্রাপ্ত এক জড়বুদ্ধি শিশুর কথা। যাকে উদ্ধার করে আসাইলামে পাঠানো হয়, চিকিৎসা করা হয়। ভারতে প্রথম দুর্বল বুদ্ধির শিশুদের জন্য স্কুল খোলা হয় মাদ্রাজে ১৮৪১ সালে। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথম এমন স্কুল প্রতিস্থা হয় ১৯১৮ সালে কার্সিয়াঙে।[৫]

মানসিক প্রতিবন্ধী, জড়বুদ্ধি, অটিস্টিক, সেরিব্রাল পলসি এইসব মানসিক অবস্থানগুলি অনেক ক্ষেত্রে একইরকম মনে হয়। কিন্তু আদতে এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অটিস্টিক আক্রান্তেরা বুদ্ধিমান হয়। সেরিব্রাল পলসির ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক উভয়ত প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়, তবে এদের মধ্যে জড়তা থাকলেও কেউ কেউ বুদ্ধিগত দিক থেকে স্বাভাবিক হয়। একটু বিশদে ব্যাখা করা প্রয়োজন।

অটিজিম কেন হয় তার কারণ এখনও পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। একজন সুস্থ বাচ্ছাও জন্মানোর বহুদিন পর অটিজিমের শিকার হয়েছে দেখা যায়। অটিস্টিক শিশুদের সাধারণত সামাজিক সম্পর্ক নির্মাণে অক্ষমতা, ভাষাগত সমস্যা, ভাবের আদান প্রদানে সমস্যা, আচরণগত বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। হয়তো দেখা যায় কিছু অটিস্টিক শিশু একই কাজ বারবার করছে, কেউ একলা বসে আছে, কেউ অনবরত গান গাইছে, কেউ অবিরাম ছটফট করছে, কেউবা সামান্য শব্দতেও ভয় পাচ্ছে। অটিজিমের চিকিৎসা সে অর্থে কিছু নেই। এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে অটিজিম আছে কিনা বোঝা যায় না। অনেক বিখ্যাত মানুষদের অটিজিম ছিল বলে মনে করা হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মোজার্ট, আইনস্টাইন, বিল গেটস, বব ডিলান, স্টিভ জোবস প্রমুখ। এদের প্রত্যেকের আচরণগত সমস্যা ছিল।

অন্যদিকে প্রতিস্পর্ধী এইসব অবহেলিত মানুষদের প্রতিবাদের মুখ হয়ে উঠেছেন যিনি সেই জিজা ঘোষ যিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিদ্যায় স্নাতক ও দিল্লি

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজসেবাবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন, তিনি নিজেই একজন সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত।

বিদেশী লেখকদের মধ্যে আইরিশ কবি শিল্পী ক্রিস্টি ব্রাউনের নাম করতে হয়। শুধু মাত্র বাঁ পা দিয়ে তিনি সব কাজ করতে পারেন। ভালো করে লিখতে বা কথা বলতে পারেন না তিনি। আর এইটুকু সম্বল করে ১৯৫৪ সালে লিখে ফেললেন আত্মজীবনী 'My Left Foot' । ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় বহুপ্রচারিত আত্মজৈবনিক উপন্যাস 'Down All the Days'।

নেপালের আর এক লেখিকা ও সাংবাদিক নাম ঝমক গিমিরে। এই নারী কান্তিপুর সংবাদপত্রের কলাম লেখিকা। বাঁ পায়ের সাহায্যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী লেখেন ২০১১ সালে নাম 'Jiwan Kada Ki Phool' যার বাংলা হল 'জীবন কাঁটার ফুল'। কথা বলতে পারেন না এই লেখিকা। তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। বইগুলির নাম হল- 'Sankalpa', 'Aafnai Chita Agni Shikhatira' (Own's funeral pyre towards the fire apex), 'Manchhe Bhitraka Yoddaharu' (Warriors inside humans),'Quaati'।

সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত আমেরিকান অভিনেত্রী গেরি জুয়েলস যিনি একজন লেখিকাও বটে। ২০১১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর বই 'I'm Walking as Straight as I Can' ।

শুধু সেরিব্রাল পলসি নয়, অটিসিম আক্রান্ত মানুষরাও অনেকেই সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে দুএক জনের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। আমরা হয়তো তেমন মানুষদের নাম শুনলে অবাক হয়েই যাবো। প্রথমে বলা যায় ভার্জিনিয়া উল্ফের(১৮৮২-

১৯৪১) কথা। বিখ্যাত এই লেখিকা ভাষা শিখতে অনেকটা সময় লেগেছিল। তাঁর অবসেসান ছিল পেন নিয়ে। তিনি কারো চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতেন না, এমনকি লজ্জা পেতেন বাচ্ছাদের মতো।

হান্স অ্যান্ডারসন(১৮০৫-১৮৭৫) ডেনমার্কের এই লেখকের রূপকথার গল্প পড়েনি এমন মানুষ খুবই কম আছেন। কিন্তু অ্যান্ডারসনের মধ্যে সামাজিক বোধের অভাব ছিল, তিনি একা ও বিষণ্ণ থাকতেন। কথা বলতেন স্বাভাবিকের থেকে জোরে।

মিচেল ফিটজেরাল্ড একটি বই লিখেছিলেন 'Unstoppable Brilliance - Irish Geniuses and Aspergers Syndrome' নামে। এই বইয়ের লেখক নয় জন আইরিশ লেখকের তালিকা দেন যারা অটিজিম থাকা সত্ত্বেও প্রতিভাবান। এই তালিকায় ছিল 'উইলিসিস' জেমস জয়েসের নাম। এই আস্পারাগাস সিনড্রোম আছে এমন আরও কিছু লেখকের মধ্যে আছেন এমিলি ব্রন্টি, লুই ক্যারল, এমিলি ডিকিন্সন প্রমুখ।

শুধু লেখক নন, ইউরোপীয় সাহিত্যে বহু উপন্যাস বা ছোটগল্পে অটিসিম বা সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত চরিত্রদের দেখা যায়। অসংখ্য বইয়ের মধ্যে থেকে দু একটি বইয়ের নাম করা যায়। ১৯৯৬ তে প্রকাশিত আমেরিকান লেখক স্টিফেন কিং-এর বই 'দি রেগুলেটর' বইতে রয়েছে সেথ গারিন নামের এক চরিত্র। ২০০২ সালে প্রকাশিত ডিন কুন্ট-এর উপন্যাস 'বাই দি লাইট অফ দা মুন' উপন্যাসে শেফার্ড অকনুর চরিত্র, ২০০৬ সালে

প্রকাশিত নিকলাস স্পার্কের উপন্যাস 'ডিয়ার জন' উপন্যাসের আল্যান হুইডন এমন বহু চরিত্র স্থান পেয়েছে ইউরোপীয় সাহিত্যে।

এমনকি সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত চরিত্র রয়েছে এমন সাহিত্যও কম নেই। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ২০০৬ সালে প্রকাশিত হারিয়েট জনসনের উপন্যাস ' এক্সিডেন্ট অফ নেচার' উপন্যাসের কথা। এই কাহিনির চরিত্র ১৭ বছরের মেয়ে জেন একজন সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত মেয়ে, কিন্তু সে জানে না তার এই সমস্যা নিয়ে, সে সাধারণ মানুষের মতো মনে করে নিজেকে, কারণ সে কোনোদিন বিশেষ প্রতিবন্ধী মানুষদের দেখেনি। এই ভুল তার ভেঙে যায় একটি ক্যাম্পে গিয়ে।

২০০৯ সালে প্রকাশিত লেই ব্রেলের উপন্যাস ' এ ডগ নেম স্লাগার' । উপন্যাসে মধ্যমণি একটি কুকুর যে সবকিছু পরিবর্তন করে দিয়েছিল সেরিব্রাল পলসি আক্রান্ত একটি মেয়ের জন্য। ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় ক্রিস্টেন ডেবায়ার-এর উপন্যাস ' বি কোয়ায়েট, মেরিনা'। এই উপন্যাসের দুই চরিত্র মেরিনা ও ময়রা একজনের সেরিব্রাল পলসি, অন্যজনের ডাউন সিনড্রোম। একজন ছটফটে, আর একজন চুপচাপ।

এমন বহু বই লেখা হয়েছে বিদেশী সাহিত্যে রেবেকা এলিয়টের 'জাস্ট বিকস' ; এমা ব্রিচের 'হেইলিস ফ্রেন্ড'; সুজান কামাতার ' দি গাজেট গার্ল'; বেথ হারির ' মেলানি, বার্ড উইথ ব্রোকেন উইং; সান্দ্রা ব্রান্নান-এর 'নোয়াস রেনি'ডে' প্রভৃতি উপন্যাসে।

বাংলা সাহিত্যে জড়বুদ্ধি, সেরিব্রাল পলসি, অটিস্টিক চরিত্রদের দেখা গিয়েছে বেশ কয়েকটি উপন্যাসে। প্রথমেই নাম করতে হয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯৯৮-১৯৭১) উপন্যাস ‘পঞ্চপুত্তলী’(১৯৫৫)-র ফড়িং-এর। উপন্যাসের কাহিনি আবর্তিত নায়ক মাটির মূর্তি শিল্পী মলিনকে ঘিরে। এই মলিনের একদা প্রেমিকা, ভিখারি কন্যা টিয়ার ভাই হল ফড়িং। টিয়া তার ভাইকে মলিনের সঙ্গে কোলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। ফড়িং সম্পর্কে লেখক বলেছেন—

‘ফড়িং হাবা হলেও দেহ খুব অপটু নয়। অপটু ওর বুদ্ধিতে, জড়তা ওর কথায়।... মধ্যে মধ্যে কথায় বিসর্গ যোগ করলে যেমন উচ্চারণ হয়, জড়তা হেতু ঝোঁক দিয়ে কথা বলার জন্যে তেমনি বিসর্গান্ত উচ্চারণ হয়ে ওঠে।... আর দন্ত্য ‘স’ এবং ‘দ’য়ের উচ্চারণ স্পষ্ট হয় না। অকারণে বা অতি সামান্য কারণে হিহি করে হাসে। আবার হঠাৎ হাসি থামিয়ে ত্রস্তভাবে সকলের হাসিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যায়। কর্মহীন অবসরে অসাড়ের মত বসে থাকে, মুখটা হাঁ হয়ে যায়’।[৬]

তবে এ হেন তথাকথিত হাবা গোবা অন্যতর সক্ষম মানুষটির গুণও আছে। লেখক লিখেছেন—

‘...খাটতে পারে এবং এঈ আড়াই তিন বছর চন্দননগরে মলিনের কাছে থেকে কাজগুলি বুঝেছে,শিখেছে। আর একটা আশ্চর্য গুণ ফড়িঙয়ের, ওর নিষ্ঠা। কাজটি পরিপাটি না হলে কিছুতেই মনোমত হয় না’।[৭]

অবশ্য উপন্যাসের শেষে ফড়িং ছুরি বসিয়ে দেয় মলিনের পিঠে, এবং ভয়ে পালাতে গিয়ে রেললাইনে কাটা পড়ে মারা যায়। ফড়িংয়ের এই পরিণতি পাঠকদের বিচলিত করে। তার বিসর্গ মিশ্রিত বুলি হয়তো কানে বাজে কোথাও।

হুমায়ুন আহমেদের ‘ নন্দিত নরকে’(১৯৭২) উপন্যাসে রাবেয়া নামের মেয়েটির মধ্যেও বুদ্ধির স্বাভাবিকতা ছিল না। ছোটবেলায় দরজার চৌকাঠে পরে গিয়ে মাথায় আঘাত পায় সে। তারপর থেকে সে স্বাভাবিক নয়। বড় হলেও বুদ্ধি বাচ্ছাদের মতো। সারাদিন ঘুরে বেড়ানো তার কাজ। এমনকি তার এই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে বাড়িতে আশ্রিত মাস্টার কাকা। গোপন এই খবর জানাজানি হয় সে যখন গর্ভবতী হয়। সে বলতেই পারে না সেই পুরুষের নাম যে তাকে এই সর্বনাশটি করেছে। রাবেয়ার বাবা মা বিষ খাইয়ে মারতে চায় মেয়েকে—‘শুনলাম বাবা চাপা কণ্ঠে বলছেন, ‘ বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে’। শেষ পর্যন্ত নিজেই মরে যায় রাবেয়া, গর্ভপাত করাতে গিয়ে রাবেয়ার বাবা মা রাবেয়াকে একপ্রকার খুন করে বলতে গেলে। শেষ হয় একটা আস্ত জীবনের গল্প। এইভাবেই মুছে যায় সমাজের অন্ধকারে পরে থাকা কত অসহায় জীবন তার হিসেব কোথাও লেখা হয় না।

নায়িকার ভাই হিসেবে জড়বুদ্ধি চরিত্র রয়েছে তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ উপন্যাসে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শ্রুতি। এই শ্রুতির এক ভাই নাম অলোক। যাকে শ্রুতি ‘ওলু’ নামে ডাকে। তার সম্পর্কে লেখিকা লিখেছেন—

'অলক। কীরকম করে যেন স্বাভাবিক নয় ও। স্বাভাবিক হল না। মা বলত – 'ওলু,ওলু'। অলক হাসত। একটানা বলে যেত—'ব্যাটো-বলঅ, ব্যাটো-বলঅ' অথবা বলে যেত—সুজি খাব। সুজি খাব'। যাই বলত ও একটানা বলত।... প্রথম প্রথম মজা পেত তারা।...ভাবত ছেলেমানুষি। ভাবত প্রথম কথা বলতে শেখার অপার্থিব প্রকাশ। ক্রমে ভুল এসে ধরা দিল নিজস্ব ক্রূর সত্যে।... ও মানসিক প্রতিবন্ধী থাকল। ও মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধী, নিজের মানসে নিজের মস্তিস্ক বিকল'।[৮]

এই যে বারবার একই কথা উচ্চারণ করা এটা অটিজিমেরই চিহ্ন। কিন্তু কোনো

থেরাপি বা চিকিৎসা হয়নি ওলুর। ভাইয়ের এই সমস্যার জন্য বাড়ির লোকের মানসিক অবস্থার চিত্রটিও তুলে ধরেছেন লেখিকা—

' অলককে চিনিস না? শ্রুতির ভাই। ইস,দ্যাখ কী কষ্ট লাগে! ওর ভাই না মানসিক প্রতিবন্ধী। জড়বুদ্ধি। জড়।...শ্রুতির দুই চোখে জল এসে যায়। ...শ্রুতির দর্শন মতো জড় বুদ্ধির আকার পিরামিড। ওলু,অলক, ওই পিরামিড বুদ্ধি নিয়ে আছে। বেঁচে আছে'। [৯]

শ্রুতি ও অলকের মা কিন্তু ছেলের এই জড়বুদ্ধিতাকে নিজের পাপের ফল বা অভিশাপ মনে করতেন। অধিকাংশ মানুষই তাই মনে করে। তবু ভাইকে সে মা মারা যাবার পর মায়ের স্নেহ দিয়েছে, সমাজের বিভিন্ন মানুষের করুণা বাক্যকে সে ঘৃণা করেছে মনে প্রানে। আর তাই পড়াশোনার জন্য হোস্টেলে যাবার সময় ভাইয়ের জন্য কষ্ট হয়েছে তার।

তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে। ওলু বড় হয়েছে। বাড়িতে যেমন করে বড় হয় বিনা চিকিৎসায় সেই রকম। তার যৌনতার বোধ জেগেছে। একদিন শ্রুতির ঘরে এসে এসে তার যৌনতার প্রকাশ করে ফেলেছে বিছানায় শরীর ঘষে ঘষে। শ্রুতি কষ্ট পেয়েছে, ঘৃণা করেছে ভাইকে, কিন্তু তারপর ভেবছে–

' ওলু– ও কী করবে! ওর জৈবিক ধর্ম ওকে এই আচরণে প্রবৃত্ত করেছে। অপরিণত বুদ্ধি ও। জড়বুদ্ধি।... রক্তমাংসের সচল জড়পিণ্ড। খিদের বোধ যখন আছে ওর, প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মাদির বোধ আছে যখন, কামবোধ থাকবে না কেন!'[১০]

বাংলা ছোটোগল্পেও আমরা এমন বহু মানসিক প্রতিবন্ধী চরিত্র দেখতে পাবো। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে এমন বেশ কয়েকটি চরিত্র রয়েছে। প্রথমে যে গল্পটির উল্লেখ করতে হয় সেটি হল 'সরীসৃপ'। এই গল্পের প্রধান চরিত্র চারু। চারুর স্বামী এবং পুত্র ভুবন দুজনের মধ্যে মানসিক প্রতিবন্ধকতার ছাপ রয়েছে। চারুর স্বামীকে চিহ্নিত করা হয়েছে 'আধপাগলা' হিসেবে। আর ভুবনের পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

'ঘরের ভিতর হইতে ভুবন থুপথুপ করিয়া পা ফেলিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে অত্যাশ্চর্য মোটা'। [১১]

বাবার জিন থেকে ছেলের মধ্যে কি এই প্রতিবন্ধকতা এসেছে? হতেও পারে। তবে এই গল্প একটি শিক্ষা দিয়ে যায় এই যে, এই ধরণের ছেলেদের ভবিষ্যৎ ভরন পোষণের ব্যাপারে। চারুর সমস্ত দুশ্চিন্তা ছিল ছেলেকে নিয়ে। তাই সে পদ্মকে বলে–'আমি যে

চিরকাল বাঁচব না পদ্ম, তখন কি হবে?' মা চারু দেখতে চেয়েছিলেন তার অবর্তমানে ছেলে কেমন থাকেন। আর এজন্য তিনি কাশীতে চলে যান। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে ভুবনের প্রতি কেউই তেমন খেয়াল রাখেনি। চারুর মৃত্যুর পর রক্ত সম্বন্ধহীন বনমালী নামের চরিত্রটি এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়। সে সঙ্কল্প করে ভুবনের ' বুদ্ধির জড়তা বিনষ্ট' করবে। আর তাই—

' খাওয়ার সময় বনমালী ভুবনকে কাছে খাইতে বসায়, প্রায়ই তাহাকে সঙ্গে লইয়া মোটর চাপিয়া বেড়াইতে যায়, অবসর সময়ে কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে কথা বলে, তাহাকে নানান বিষয় শিখাইবার চেষ্টা করে'।[১২]

বনমালীর বারবার মনে হয়েছে—'ওকে চারুদি বোকা করে রেখেছিল, আসলে ও বোকা নয়'।[১৩]

বনমালীর এই প্রত্যয়টা বাস্তব। অধিকাংশ বাবা মা তাঁদের মানসিক বিকাশে অক্ষম সন্তানকে ঘরে বন্দি করে রাখেন। ফলে সেই সমস্ত সন্তানদের সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। বনমালী এখানে একজন সঠিক স্পেশাল এডুকেটরের কাজ করেছে। আর তার সেই প্রশিক্ষণে ভুবনের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে অপ্রত্যাশিত। বনমালী তার বৃদ্ধ মাকে ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব সুস্থ মানুষকে দিলে সে মনে রাখেনি। কিন্তু ভুবন মনে রেখেছে। সঠিক সময়ে সে সচেতন করে দিয়েছে ভুবনকে। ভুবনের এই উন্নতিতে খুশি হয়েছে বনমালী। তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বনমালীর ব্যস্ততার সুযোগে ভুবনের মাসি পরী ভুবনকে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে একা একা একটি ট্রেনের কামরায় তুলে দেয়। হারিয়ে যায় ভুবন। এটাই হয়তো অনাথ মানসিক প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়েছেন। যে বনমালী ভুবনকে নতুন জীবন দিতে চেয়েছিল সেই বনমালীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ভুবনের 'খোঁজ করলি নে?' বনমালী উত্তরে বলে—' আপদ গেছে যাক'। আপদই বটে।

মানসিক প্রতিবন্ধী নারী চরিত্রকেও তাঁর সাহিত্যে একেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তারপর' গল্পে রয়েছে হাবোর কথা। এই হাবো সম্পর্কে লিখেছেন— 'একটু হাবাগোবা মেয়েটা, চোখ একটু ট্যারা, হাড়গিলের মতো রোগা শরীর' । মুখ দিয়ে লালা পড়ে হাবোর। হাবোকে সঙ্গে রাখে শারীরিক প্রতিবন্ধী গজেন। হাবো পছন্দ করে গজেন কে। তাকে ভালোবাসে। যত্ন নেয় গজেনকে। গজেন ভাত বেড়ে দিতে বললে সবার আগে হাবো এগিয়ে আসে। গজেন হাবোকে প্রস্তাব দেয় কটিবাজারে সে তার সঙ্গে যাবে কিনা? সেখানে গেলে সে হাবো স্বাবলম্বী হবে, কাজ করে খেতে পারবে। হাবো রাজি হয়ে যায়। কিন্তু কটিবাজারে নারী পাচারকারী গজেনকে অন্য নারীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে অভিমান আহত হাবো গায়ে কেরসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে। সুস্থ জীবন যাপনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায় সমূলে।

২০১৮ সালে ‘গুরুচণ্ডাল’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘বিনায়কুর ডায়রি’। বিনায়ক রুকু ষোলো বছরের অটিস্টিক কিশোর। তার লেখা ডায়রির পাতা ও ছবি দিয়ে চমৎকার হয়েছিল সেই লেখাটি। একটু উদাহরণ পেশ করি —

‘আমি রুকু বিনায়ক। সবাই বলে আমি বুদ্ধু। ভোঁদাই। মা আমাকে গাধা বলে না মুনা বলে। পাপা বলে পুচাই। আমার দুটো হাত,দশটা হাতের আঙ্গুল,দুটো চোখ আছে,যা দিয়ে আমি ছবি আঁকা। পাপা মা বলে আমার অটিজম আছে। অটিজম কী আমি জানিনা। তবে আমি একটু কেমন যেন।

আমার গাড়ির চাকা,টেবিল ফ্যান,ছোট ছোট রবারের পুতুল ,রং,তুলি পেন্সিল ভালো লাগে। আমি লাফাতে ভালোবাসি। এ দেয়াল থেকে ও দেয়াল। সব দেয়ালে হাতের চাপ,সব দেয়ালে সর্দি,নাকের পোঁটা লাগে। মা বলে যাতা। আর মোছে’।

আবার ডায়রি ৪ এ লিখছে সে—

‘সাউন্ডে আমার ভয় করে। বাজে একটা ফ্যা করে আওয়াজ হয়, বিরক্ত লাগে। কোন কিছু ল্যাগড্যাগ করলে, নখ কাটলে,চুল কাটলেই।ফ্যা,কচ কচ। লোডশেডিং হলে আমি চিৎকার করি মায়ের হাত ঝাঁকাই। মা বলে বিহেব, বিহেব। আর বলে ও গড। বিহেব হবোনা আমি রুকু হবো। মা দিওয়ালি দিওয়ালি খেলে । উঠোনে মোম। আমরা সারা উঠোনে) (মোম জ্বালিয়ে রাখি সম্রাট,ছোটু, মন্টু বলে খেপেছে খেপেছে। আমি সবার নাম ধরেডাকি। ছেলেটা তাড়া করে । সাইকেল এর ঝুড়িতে থান ইট দিয়ে দেয়। আমি নেমশেক নেমশেক খেলি’।

এই লেখার সঙ্গে রয়েছে বিনায়কের আঁকা নানান ছবি। বাংলা ভাষায় এমন একটি লেখা সত্যি বিরল। ডায়রির শেষে বিনায়ক রুকুর মায়ের কথা রয়েছে—

'আমি একজন স্পেশাল মানুষের মা।বিনায়করুকু আমার পুত্র।তার অটিজম আছে। তার ১৬ বছর বয়েস। রুকু অনেক কিছু পারেনা।গুছিয়ে কথা বলতে পারেনা,গুছিয়ে লিখতে পারেনা,জগৎ টাকে নিজের মত করে দ্যাখে।যা ভাবে তাই লেখে। লেখে নিজের শর্তে বাঁচে নিজের শর্তে। বিচারের ভার পাঠকের উপর'।

আমরা চেষ্টা করলে বিনায়ক রুকুদের জন্য এনে দিতে পারি একটা নতুন পৃথিবী।

উল্লেখপঞ্জী :

১৷ আমার সন্তান স্পেশাল চাইল্ড।ভূমিকা। সংকলন : সব্যসাচী পড়ুয়া। অভিযান পাবলিশার্স। ২০১৭

২. দশে মিলি করি পাঠ। সোমনাথ মুন্সী। বিকাশায়ন। ২০১২। পৃষ্ঠা ১৮।

৩. ব্যাতিক্রম ধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপিকা সারাওয়াতারা জামান। মাওলা ব্রাদার্স। ২০১৪। পৃষ্ঠা ৭২।

৪. মহাভারত। কাশীরাম দাস।

৫. ব্যাতিক্রম ধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপিকা সারাওয়াতারা জামান। পৃষ্ঠা ৭৯।

৬. পঞ্চ পুত্তলী । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর রচনাবলী। মিত্র ও ঘোষ। পৃষ্ঠা ৭৫।

৭. তদেব।

৮. চাঁদের গায়ে চাঁদ। তিলোত্তমা মজুমদার।আনন্দ পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা ১৮।

৯. তদেব

১০. ঐ। পৃষ্ঠা ১৭৮।

১১. মানিক গল্প সমগ্র। ২য় খণ্ড। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এসবিএস পাবলিকেশন। পৃষ্ঠা ৬০৩।

১২. তদেব

১৩. তদেব পৃষ্ঠা ৬২১।

বাংলা সাহিত্যে শ্রবন ও বাকগত অন্যতর সক্ষম :

অবস্থান, পরিণতি

বাংলা সাহিত্যে মূক ও বধির অন্যতর সক্ষম চরিত্র: অবস্থান ও পরিণতি

যারা কথা বলতে পারে না কিংবা শ্রবনে অক্ষম, আমাদের সমাজ তাদের কে বোবা ও কালা হিসেবে দেগে দেয়। এমন কি আমাদের বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ চর্যাপদের কবিতায় গুরু ও শিস্যকে বোবা ও কালা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে সহজিয়া ধর্মের দুর্বোধ্যতার কারণে।

"জেতই বোলবি তেতবি টাল

গুরু বোব সে সীস কাল।" (৪০ সংখ্যা চর্যা , কাহ্নপাদ)

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় সাড়ে তিনশ বছর আগে গ্রিক পণ্ডিত ও সাহিত্য তাত্বিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন—' Men that are deaf are also speechless; that is, they can make vocal sounds but they cannot speak... Let it be a law that nothing imperfect should be brought up.' মনে করা হয় এই মন্তব্যের জন্য পাশ্যাত্যে একসময় প্রতিবন্ধীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভঙ্গী তৈরি হয়। যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৩০০ বছর পর রোম সম্রাট জাস্টিটসিয়ান শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা দিয়ে আইন প্রণয়ন করেন। সেকালের শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা যে কৃষিকার্য বা সৈনিকের কাজ করত তা বহু তথ্য থেকে জানা যায়। জিওরলামো কারদানো নামের

এক ইতালীয় গণিতবিদ ষোড়শ শতকে প্রথম বধিরদের শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পেদ্র পোন্সে দে লিওন নামে এক সাধু প্রথম বধিরদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১

ভারতবর্ষের শ্রবণ অক্ষমদের জন্য কাজ শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতকে। ফ্রান্সের ‘প্যারিস ইন্সটিটিউট’ প্রকাশিত ‘The Quatrieme Circulair’ থেকে জানা যায় এশিয়ায় প্রথম মূক ও বধির স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতায়। একজন বাঙালি নাম বাবু যামিনী নাথ ব্যানার্জি ১৮৯৩ সালে প্রথম কলিকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতার আগে ভারতে মোট ৩০ টি স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।

প্রশ্ন হল কাকে বলে শ্রবণ প্রতিবন্ধী? সাধারণত আমরা যারা শ্রবণ সক্ষম তারা ০ থেকে ২৬ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দ স্বাভাবিক ভাবে শুনতে পাই। এরপর মাত্রা অনুযায়ী শ্রবণ অক্ষমতা নির্ণীত হয়। যারা কানে শুনতে পায় না তাদেরই শ্রবণ অক্ষম বা বধির হিসেবে আমরা জানি। সাধারণত জিনগত কারণ, রুবেলা সংক্রমণ, সাইটোমেগালো ভাইরাস আক্রমণ, গর্ভকালীন অবস্থায় মা যদি ভুল ওষুধ খান প্রভৃতি কারণে বধিরতা তৈরি হয়। সাধারণত যারা জন্ম বধির তাদের মধ্যে বাক প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়। এছাড়া ব্রেনের আঘাত থেকেও বাক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হতে পারে।

সাহিত্যে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী চরিত্র বহু কাল থেকেই রয়েছেন। বিশেষত ইউরোপীয় বা আমেরিকান সাহিত্যে বেশ কিছু জন প্রিয় উপন্যাসে এই ধরণের চরিত্র রয়েছে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের যুদ্ধ কেন্দ্রিক উপন্যাস ‘For Whom the Bell Tolls’(১৯৪০) ;

যেখানে রয়েছে বোবা চরিত্র এল সোরদো, যে একাধারে ফ্যাসিস্ত বিরোধী গরিলা যোদ্ধা। কিংবা হারপার লির বিখ্যাত উপন্যাস 'To Kill a Mockingbird'(১৯৬০) টুট্টি ও ফুট্টি নামক দুই বোবা মেয়ের কথা কে ভুলতে পারে। ভিক্টর হুগোর 'হাঞ্চবাঙ্ক অফ নত্রদাম' উপন্যাসের কুঁজো চরিত্রটি কানে শুনতেও পেত না। গীর্জার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কখন যেন সে কালা হয়ে গেল। একই রকম ভাবে বন্দুকের গুলির শব্দে বধির হয়ে গিয়েছিল উইলিয়াম ফকনারের ট্রিলজি উপন্যাস 'দি ম্যানসন' এর লিন্ডা স্নোপেস চরিত্রটি।

বাংলা সাহিত্যে বধির চরিত্র জনপ্রিয় করেন রবীন্দ্রনাথ, 'সুভা' গল্পটির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অবশ্য বধিরতা বা ভাষাহীনতা বিভিন্ন রূপকে এসেছে বারবার। 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'সান্ত্বনা' কবিতায় লিখেছেন—

'ওরে বোবা মাটি,
বক্ষ তোর যায় না তো ফাটি
বহিয়া বিশ্বের বোঝা দুঃখবেদনার
বক্ষে আপনার
বহু যুগ ধরে।
বোবা গাছ ওরে,
সহজে বহিস শিরে বৈশাখের নির্দয় দাহন, --
তুই সর্বসহিষ্ণু বাহন
শ্রাবণের

বিশ্বব্যাপী প্লাবনের’।

‘আলোচনা’ গ্রন্থে তিনি বধির শব্দটিকে অরসিক অর্থে প্রয়োগ করলেন—

‘শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কানের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না’।

বিভিন্নভাবে বধির বা বোবা শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন তিনি বিভিন্ন লেখায়, তার কয়েকটি উদাহরণ —

ক. বধির আঁধার তব/আমায় পৌঁছিয়া দিল কূলে।(খেয়া, সার্থক নৈরাশ্য)

খ. বধির নিদয় কঠিন হৃদয়/ তারে প্রভু দাও কোল ।(মানসী, ধর্ম প্রচার)

গ. জানাজানির সময় গেছে,/বোঝাপড়া কর্ রে বন্ধ। অন্ধকারের স্নিগ্ধ কোলে/ থাক্ রে হয়ে বধির অন্ধ।(ক্ষণিকা, শেষ হিসাব)

ঘ. পঙ্গু মুক কবন্ধ বধির আঁধা/ স্থুলতনু ভয়ংকরী বাধা । (বলাকা ৮)

ঙ. আপন গর্জনে বিশ্ব আপনারে করেছে বধির (মানসী, নিষ্ঠুর সৃষ্টি) ।

গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত ‘সুভা’ গল্পটি বহু আলোচিত একটি । গল্পের শুরুতে আছে— ‘মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে’। গল্পের মূল সমস্যা মেয়েটির এই বাক প্রতিবন্ধকতা। প্রতিবন্ধী মেয়েদের সামাজিক নানা সমস্যা

ও মনস্তত্ত্ব এই গল্পে ফুটে উঠেছে। প্রতিবন্ধী সন্তানকে অনেক সময় বাবা মা নিজেরই লজ্জা মনে করে, সুভার ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে– 'যে কথা কয় না সে যে অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এইজন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি'।

আর অন্যতর সক্ষম মানুষদের মধ্যে এই হীনমন্যতা জন্ম নেয় বাবা মায়ের কারণে, কারণ—

'মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশরূপে দেখেন-- কন্যার কোনো অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন'।

সুভার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে এক করেছেন। প্রকৃতিরও যেমন ভাষা নেই, সুভারও তেমনি ভাষা নেই। 'নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর, সমস্ত মিশিয়া চারি দিকের চলাফেরানের সহিত এক কম্প-আন্দোলন-হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়উপকূলের নিকটে আসিয়া-ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা-- ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী-বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে বিস্তার;' অথচ সুভার কল্পনাশক্তি আছে সাধারণ মানুষের মতো। সে পাতালপুরীর রাজকন্যা হতে

চেয়েছে। তার ভালো লাগার মানুষ প্রতাপকে চমকে দিতে চেয়েছে। হয়তো ভালবেসেছে মনে মনে। কিন্তু ভাষাহীন সুভা সাধারণের বোধ্য ভাষায় সে তার ভালো লাগার কথা প্রকাশ করতে পারেনি প্রতাপের কাছে। তাই প্রতাপ যখন সুভাকে তার বিয়ের খবর শুনে অভিনন্দন জানায় সুভা অভিমানাহত হয়—' মর্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল;'

প্রতিবন্ধী কন্যাকে জীবনের বোঝা মনে করে সুভার বাবা-মা অসহায় কন্যাটিকে পাত্রস্ত করল তথ্য গোপন করে। ফলে যখন জানাজানি হল তখন বড়ো একা হয়ে গেল সুভা। 'সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ সে ভাষা বুঝিতে পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় নাবালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম -- অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল'।

'সুভা'র মতো আর একটি মূক ও বধির চরিত্র এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ 'শুভদৃষ্টি' গল্পে। সুভার মতো এর নাম সুধা। 'মেয়েটি কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশুপক্ষীর প্রিয়সঙ্গিনী'। সুধার বিয়ে হয়ে যায় আকস্মিকভাবে। তবে এই গল্পে পাত্রীর বাবা নবীনচন্দ্র তথ্য গোপন করে মেয়েকে পাত্রস্ত করেনি। পাত্র কান্তিচন্দ্র নিজে না জেনে শুধু সুধার রূপ দেখে মুগ্ধ

হয়েছিল। এখানেও প্রতিবন্ধী চরিত্রেরা যে কতখানি অবহেলিত সেই বার্তা দিতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

বধির ও বাক প্রতিবন্ধীকে নিয়ে প্রথম উপন্যাস লেখেন নিরুপমা দেবী(১৮৮৩-১৯৫১)। তাঁর লেখা 'শ্যামলী' (১৯১৮) উপন্যাসটি শ্যামলী নামের এক বধির মেয়ের জীবন আলেখ্য। লেখিকা জানিয়েছেন—'শ্যামলীর কোন পরিচয় নাই। সে যে আজন্ম বধির, আজন্ম মূক'। উপন্যাসের শুরুতে আমরা শ্যামলীকে দেখি বৃষ্টিতে ভিজতে, তার মা তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চায় কিন্তু—'পাগল নড়িল না'। শ্যামলীর বোন বিজলী তার দিদি সম্পর্কে বলে— 'সেয়ানা পাগল বোঁচকা আগল!' রাগটুকু বিলক্ষণ আছে! তাও যদি শুনতে পেত, আর কথা কইতে পারত, তাহলে না জানি কি করত!'[৩] এইভাবে নেতিবাচক সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় প্রতিবন্ধী চরিত্রদের। এমনকি প্রতিবন্ধী সন্তানের বাবা মায়েরা নিজের সন্তান সম্পর্কে কি ভাবেন সে কথাও আমাদের ভাবতে হবে। শ্যামলীর বাবা মা শ্যামলীর বিয়ের জন্য চিন্তিত শুধু নন, সন্তানের এই প্রতিবন্ধীতাকে নিজেদের কর্মফল মনে করেন—'যাদের জন্মজন্মান্তরের কর্মফলে অঙ্গহীন সন্তান হয়,তাদের তো ঐসব কষ্ট ভোগ করতে হয় চিরকাল,তার জন্য রাগ করে কোনো ফল নেই তো!' সেকালের সমাজ ছিল বড়ো বালাই। মেয়েদের বেশি বয়সে বিয়ে দিলে সমাজপতিদের কটাক্ষ ছুটে আসত। শ্যামলীর বাবা তাই ছোটোমেয়ের বিয়ের আসরে বড় মেয়েটিকেও লুকিয়ে বিয়ে দিতে গিয়ে ধরা পরে। আর ধরা পরে তাঁর সাফাই হল—

'যে-বিয়ে তোমরা দিতে এসেছ, এ সে বিয়ে নয়—সে কনেও নয়। এটি আমার বোবা কালা বড় মেয়ে। তার বিয়ে দিতে না পারায় গাঁয়ের মুরুব্বীরা বিজলীর বিয়ের আশীর্বাদে পর্যন্ত আমার বাড়িতে খাননি।... আমি সমাজের এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্যই এই অভাগা জীবটাকে একবার গোটাকতক মন্ত্র পড়িয়ে বিজলীর বিয়ের আগে সম্প্রদান করে নিলাম মাত্র'। [৩]

'বোবা-কালা' বলে একজন নারীর কোনো আত্মসম্মান নেই, মূল্য নেই সমাজে। এমনকি তার বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও নেই যেন। কিন্তু যার সঙ্গে শ্যামলীর এই বিয়ে বিয়ে ছেলে খেলা হল সেই পাত্র অনিল কিন্তু সহজভাবে বা হেলাফেলা করে বিষয়টিকে না নিয়ে সত্যি সত্যি শ্যামলীকেই পেতে চাইল। বরপক্ষ বাধা দিল বহুভাবে। বন্ধু শিশির বলল—'না না একি তোমার বিয়ে নাকি? একটা হাবা কালার সঙ্গে? তোমার মা কি বলবেন বল দেখি?' কিন্তু অনিলের জেদ কিছুতেই আপোষ করল না কোনো প্রস্তাবে। এবং বন্ধু শিশির বিয়ে করল বিজলীকে।

সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল অনিলের মায়ের কাছ থেকে। তিনি বললেন যে এই হাবা কালা মেয়েকে যেখানে পারে যেন রেখে আসে। নইলে সে মাতৃহত্যার পাতক হবে। এমনকি শ্যামলীর মা চায়নি অনিল শ্যামলীকে গ্রহণ করে জীবনটা শেষ করে দিক। বন্ধু শিশির যখন বলে—' তোমার মতো ছেলের পাশে ঐ রকম স্ত্রী' ; উত্তরে অনিল বলেছে—' কালা এবং বোবা, কিন্তু তবু আত্মা আছে, মন আছে। একটা ইন্দ্রিয় না থাকলে আরও এমন সব বস্তু তাতে নিশ্চই আছে—...তার উপরে সে নারী স্বভাবা, যে নারী একদিন স্ত্রী,

প্রণয়নষ্ট,সন্তানের মাতা হবার জন্যে আপনা হতেই লালায়িত হয়ে ওঠে। বোবা কালা বলে কি শ্যামলীর মনে কখনো নারিত্বের এইসব বৃত্তি জাগবে না ভাবো?' [৪]

গল্প বিভিন্ন খাতে এগিয়েছে এরপর। হরিদ্বারে মাকে নিয়ে তীর্থ করতে গিয়ে দুটি জিনিস নিয়ে ফিরেছে অনিল, অসুখের ফলে বিকৃত দর্শন রূপ আর যার সেবায় সে বেঁচে ফিরেছে সেই অনাথা এক নারী যার নাম রেবা। এই রেবার সঙ্গে তার বিয়েও ঠিক হয়েছে এক সময়, কিন্তু শ্যামলীর অসুখের খবরে সে বিয়েতে বাধা পড়েছে। রেবা এসে শ্যামলীকে তার হৃত সম্মান ফিরিয়ে দিতে চেয়েছে। এতদিনে সত্যি সত্যি সমাজ কথিত 'বোবা কালার' পুনর্বাসনের চেষ্টা করেছে অনিল। শ্যামলীর লেখ পড়ার ব্যবস্থা করেছে। ' অনিল শ্যামলীর শিক্ষকতায় মন দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। মূক বধিরকে কি প্রকারে ভাষা ও লেখাপড়া শিখাইতে হয়, তাহা সে মাঝে মাঝে মনোযোগের সহিত অভ্যাস করিয়া লইতে চেষ্টা পাইত, কিন্তু শ্যামলীরই বাধায় সে চেষ্টা তেমন অগ্রসর হইতেছিল না'।

উপন্যাসটি একটি ত্রিকোণ প্রেমের সম্পর্কের গল্প বলেছে। শ্যামলী- অনিল- রেবা। আর গল্পের মূল চালিকা শক্তি অবশ্যই শ্যামলী। এই উপন্যাসে তারও ক্রমবিকাশ হয়েছে। ঊনত্রিশ পরিচ্ছেদে লেখিকা জানাচ্ছেন— ' সন্ধ্যার পূর্বে অনিল শ্যামলীকে লইয়া বাগানে গিয়াছিল। উদ্দেশ্য—ফুলের সম্বন্ধে তাহার একটু জ্ঞান জন্মানো। নানা জাতীয় ফুল লইয়া এতক্ষণ অনিল তাহাদের বর্ণের পার্থক্য, কোমলত্ব, গন্ধ প্রভৃতির বিষয় ইঙ্গিতে শ্যামলীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছিল। তাহাদের দুই চারিটির নামও শ্যামলী একটু যেন উচ্চারণ করিতে পারিতেছে। অনিলের সাধনার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। শব্দ উচ্চারণের

মুখের ও ওষ্ঠের যে ভঙ্গী হয়, তাহার অনুকরণ করিয়া শ্যামলী এখন অস্পষ্টভাবে কতকগুলো ছোট ছোট শব্দ উচ্চারণ করিতে পারে'। [৫]

এই পরিবর্তন দেখানো এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্ব মণ্ডিত করেছে। একজন প্রতিবন্ধী মানুষ তথাকথিত চিকিৎসা ও থেরাপি পেলে যে সুস্থ জীবন পেতে পারে লেখিকা নিরুপমা দেবী সে কথাই মনে করে দিয়েছেন। যা অন্য কোন উপন্যাস দেখাতে পারেনি।

বাংলা দেশের লেখক আহমেদ ছপার উপন্যাস 'ওঙ্কার' ৩৯ পাতার একটি ছোট উপন্যাস। উত্তম পুরুষ নায়কের জবানিতে গোটা উপন্যাসটি ব্যাক্ত হয়েছে। উপন্যাসে কোন সংলাপ নেই। কথক ঘটনা চক্রে নিজদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য একটি বোবা মেয়েকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সে প্রসঙ্গে তিনি জানাচ্ছেন—'ইচ্ছে হয় শ্বশুর সাহেবের কাছে গিয়ে বলি, আপনি যা দিয়েছেন ঘরবাড়ি চাকরি সব নিন। বিনিময়ে কেবল আমাকে আপনার বোবা মেয়ে রত্নটির দায় থেকে রক্ষা করুন। আমি সমগ্র জীবনের সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এমন একজন মেয়ে মানুষকে কাছে পেতে চাই—যে কালো হোক, কুৎসিত হোক, না থাকুক তার গুণপনা সে শুধু কথা বলবে, অনবরত কথা বলবে'। [৬]

এই বোবা মেয়েটি কিন্তু সংসার জীবনে কোন অভাব রাখেনি। স্বামী ফিরলে সে সবরকম ভাবে সেবা করে। কথকের ভাষায়—' বোবাদের জ্ঞান শক্তি বড় তীক্ষ্ণ। কথা যে

বলতে পারে না এ বিষয়ে পুরো সজাগ। তাই সেবা দিয়ে কথার অভাব ভরাট করতে চায়'।

অফিসে দুমাসের ছুটি নিয়ে কথক দেশের বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে নতুন করে আবিষ্কার করে। নতুন রূপ জেগে ওঠে স্ত্রীর চেহারায়। বোবা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা জাগে। বলেন– 'আমার চোখে তার বোবাত্ব ঘুচে গেছে। প্রতিটি ভঙ্গিই এখন আমার মনে শ্রেষ্ঠ কবিতার আমেজ জাগিয়ে তোলে। ...তার মুখ মণ্ডলে একটা অসহায় ভাব জলছবির মতো আপনাআপনি ভেসে ওঠে–দেখলে মনের ভেতর কি যে দুঃখস্রোত বয়ে যায়। মানুষ কেন বোবা হয়ে জন্মায়? বোবারও বা কথা বলার অত সাধ জাগে কেন?' [৭]

দিনে দিনে এই মূক বধূটির মধ্যে কথা বলার ইচ্ছে প্রবলভাবে প্রকট হতে লাগল। হারমনিয়মে বসে গোঁ গোঁ করে গান গাওয়া, কিংবা রাস্তা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মিছিল গেলে জানালা খুলে গোঁ গোঁ আওয়াজ করা, এসবের মধ্যে তার জীবনের ব্যর্থতা ও স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা দুই গল্প শুনতে পারি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের লড়াই সংক্রমিত হয় বোবা বউটার মধ্যে। উপন্যাসটি শেষ হয় একটি চমক দিয়ে। বাড়ির পাশ থেকে মিছিল যাওয়ার সময় যখন– ' বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী, সমুদ্র, পর্বত কাঁপছে।... আচানক বোবা বউ জানালা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করল। তার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কি বোধহয় ছিঁড়ে গেছে'।

সতীনাথ ভাদুড়ির(১৯০৬-১৯৬৫) ‘ ঢোঁড়াই চরিত মানস’ (১৯৪৯) উপন্যাসে ‘বৌকা বাওয়া’ বা বোবা সন্ন্যাসী চরিত্র। যে প্রথম জীবনে ভিক্ষে করলেও, দাড়ি গোঁফ গজানোর পর চিমটে আর ত্রিশূল নিয়ে সন্ন্যাসী সেজে বসে। নিজের কেরামতির গুণে সে লোকের মনে ভক্তি জাগিয়ে তোলে। আমরা জানি এই উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াই এই বৌকা বাওয়া ছাড়া টিকে থাকতে পারতো না। বৌকাকে গুরু মেনে নেয় ঢোঁড়াই। লেখক লিখেছেন—

‘বৌকা বাওয়া ঢোঁড়াইয়ের কদর বোঝে। ... বাওয়া বোবা। কিন্তু ঢোঁড়াইয়ের সঙ্গে কথা বলতে তার একটুও অসুবিধা হয়না। চোখের ইশারাতেই সে সব মনের কথা বুঝে যায়’। [৮]

বৌকা ভেবেছিল ঢোঁড়াই তার প্রকৃত উত্তরসুরী হবে, কিন্তু গানহি বাওয়ার আগমনে বৌকার প্রতিপত্তি কমে যায়। ঢোঁড়াই যখন বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বৌকা। তবু সন্তানতুল্য ঢোঁড়াইের জন্য সে নতুন ঘর তুলে দেয়, টাকা দেয়। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বৌকা কিরমম আনমনা হয়ে থাকে।‘বাওয়ার মন অস্থির অস্থির করে; নিঃসঙ্গতায় সে পাগল হয়ে যাবে নাকি!’ তারপার একদিন সে কোথায় হারিয়ে যায় মনের দুঃখে।

সুশীল জানার উপন্যাস ‘বেলাভূমির গান’(১৯৫৫)-এ মূক বেহালা বাদক চন্দ্র ওস্তাদের জীবন কথা। চন্দ্র অস্তাদের মা মুখি রাঁড়ী মারা যাবার পর দীন দাস বোবা চন্দ্রকে বড় করেছে বেহালা শিখিয়েছে। গ্রামের সবাই হাহুতাস করে—

‘ আহা, আমাদের অস্তাদের মুখটা যদি ফুটত!’

‘নাই বা ফুটল মুখ বাপুরে’। বুড়ো দীন দাস ঘুরে দাঁড়াল। ’[৯]

একটি কথা না বলেও চন্দ্র ওস্তাদ এই উপন্যাসের নায়ক। একজন অসহায় অন্যতর সক্ষম মানুষের ঘুরে দাঁড়াবার লড়াই। বহুবার তাকে প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। ছোটবেলায় মাকে পায়নি, নদীর গর্ভে ঘর গেছে তলিয়ে, মনের নারী তুলসী কে সে পায়নি। অথচ তার বাজনা শুনে প্রতিটি মানুষ মুগ্ধ। আদিত্য চৌধুরী তাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সে চর ছেড়ে যেতে চায়নি। সে একটু ভালোবাসা চেয়েছে। পায়নি কোনোদিন। ভেসে বেরিয়েছে প্রতিভা থাকা সত্বেও।

সেলিনা হোসেনের ‘উত্তর সারথি’(১৯৭১) উপন্যাসে রয়েছে মূক নারীর উপর প্রতাপশালী জমিদার সোরাবান শেখের যৌন নির্যাতনের গল্প। বাক-প্রতিবন্ধী তথা বোবা নারীদের ভাষা হীনতার কারণে তাদের উপর যৌন অত্যাচারের গল্প আমরা খবরের কাগজগুলোতে প্রায় দেখতে পাই। ২০১৭ সালে প্রকাশিত ইমদাদুল হক মিলনের ‘কালো ঘোড়া’ উপন্যাসে তেমনি এক অত্যাচারের গল্প। এটিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গল্প। রতনলালের চা-মিষ্টির দোকান। জগত সংসারে তার আর কেউ নেই—‘একটা মাত্র মেয়ে। কালী। গায়ের রংখান মা কালীর মতো। হলে হবে কী, চেহারাখানা কালীর, শরীরখান দেবীর মতন।... হা ভগবান, এইরকম মাইয়াখান হইল বোবা!বেবাক দিয়াও ভগবান

জবানটা দিল না কালীর। ড্যাবা ড্যাবা চোখে কালী যখন বাপের মুখের দিকে চায়, রতনলালের বুকটা তখন জ্বলে। ভগবান তুমি এইদা কী করলা!'[১০]

সাধারণ লোকের ধারণা বোবা বলে হয়তো কানে কম শোনে, কিন্তু রতন লাল তা বিশ্বাস করে না। কারণ রতনলাল দরজা ধাক্কা দিলেই কালী এসে দরজা খুলে দেয় দেখেছে। মেয়েকে প্রাণের অধিক ভালোবাসে রতন। মেয়ের জন্য রোজ দুটি করে মিষ্টি আনে ফেরার সময়। কিন্তু দরজায় আওয়াজ শুনে বাপ এসেছে ভেবে সে একদিন দরজা খুলে ধর্ষিতা হল—'ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কালী হঠাৎ পাগলের মতন দাপাদাপি শুরু করে। ছেঁচাতে চেষ্টা করে। কালির মুখে জবান নেই। গোঁ গোঁ একটা শব্দ হয়। মানুষটা গা করে না। এক হাতে কালীর মুখ চেপে ধরে। কী জোর মানুষটার গায়ে। কালীর নড়াচড়ার শক্তি থাকে না'। [১১] অপমানে হতাশায় আত্মহননের পথ বেছে নেয় কালী।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের গল্প 'বৃষ্টিতে দাবানল' গল্পে মূক মেয়েকে ধর্ষণের গল্প রয়েছে। আদিম খুদায় কাতর মজুর নারান প্রতিবেশিনী দাই সল্লার কাছে যায়, সল্লা বা সরলা বহু গামিনী । কোনো পুরুষ ফেরে না, তার কাছ থেকে। কিন্তু নারানকে সে ফিরিয়ে দেয়। এই রাগে নারান সল্লার মূক ও জড়বুদ্ধি মেয়ে জ্যোৎস্নাকে পাশবিকভাবে বলাৎকার করে। পরে অবশ্য সল্লার অভিযোগে নারান ধরা পড়ে মার খায়। ব্যাস এইটুকুই প্রতিবাদ।

উপন্যাসের পাশাপাশি বেশ কিছু আধুনিক ছোটগল্পেও মূক ও বধির চরিত্রদের কথা রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর চারটি গল্পে মূক ও বধির চরিত্রের কথা রয়েছে। গল্পগুলি হল 'টিকটিকি', 'জীবিকা', 'গায়েন', 'মহাকালের জটার জট'। টিকটিকি গল্পে জ্যোতিষার্ণবের বোবা মেয়ের প্রসঙ্গ রয়েছে, 'মহাকালের জটার জট' গল্পে রয়েছে 'আধাবোবা, আধাকাল,আধপাগল' সুচিত্রার প্রসঙ্গ। এখানেও প্রতিবন্ধী মেয়ের পাত্রস্থ করা নিয়ে সমস্যার গল্প। পাত্রের বাড়ির লোক দেখাশোনায় এলে সুচিত্রা অর্ধ নগ্ন হয়ে উঠানে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে। তার শরীর অনাবৃত হয়ে পড়ে। তাই দেখে সবাই ভাবে—'মেয়েটার অস্তিত্বে ফাঁক আছে কিন্তু অঙ্গের কোথাও ফাঁকি নাই'। 'গায়েন' গল্পে আছে কবিয়াল রাজেনের বোবা বউয়ের প্রসঙ্গ। আবেগের খেয়ালে সে বিয়ে করে এনেছিল তাকে। 'জীবিকা' গল্পে রয়েছে পেশাগত কারণে বধিরতা সৃষ্টি হওয়ার প্রসঙ্গ।

সমরেশ বসুর 'পকেটমার' গল্পেও পাই চটকল কর্মী গৌরমোহনের বাকশক্তিহীন ও পঙ্গু স্ত্রীর সুনয়নীর কথা। দ্রারিদ্রতার তাড়নায় গৌর বৌমা মালতীর গয়না চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে স্ত্রীর কাছে। কিন্তু স্বামীকে ক্ষমা করে দেয় সুনয়নী।

বনফুলের বোবা নামের গল্পটি মিনু কেন্দ্রিক। মিনুর বাবা মা নেই। দূর সম্পর্কের পিসির বাড়িতে সে থাকে। দশ বছর বয়সের মিনু বাড়ির সব কাজ করে দেয়। ' বোবা হওয়াতে আরও সুবিধা হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে, তবে শুনতে পায়'।[১২]

এই মিনু আপন মনে থাকে, তার আছে এক নিজস্ব জগত। যেমন শুকতারাকে সে তার মতো ক্যলা ভাঙা কাজের লোক ভাবে, জলের ঘটির নাম পুঁটি, আর গেলাসদের সে নাম দিয়েছে হারু, বারু,তারু আর কারু। পথের কুকুর তার নিজের ঘা চেটে সারিয়ে ফেলেছে দেখে মিনুর ধারণা হয় চাটলেই ঘা সেরে যায়।তাই পিসিমার পায়ের ঘা সে চাটতে গিয়ে মুখে সেপ্টিসিমিয়া হয়ে মারা যায় সে। এও এক মূক ব্যার্থ নারী জীবনের নির্মম পরাজয়।

প্রতিবন্ধীদের সামাজিক অবস্থান, পরিণতি সবসময় করুণতর। এই রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোথাও বিজয় ঘোষণা নেই, কোথাও ইতিবাচক মনোভঙ্গী নেই। শুধু এক অনন্ত ব্যার্থ জীবনের আলেখ্য যেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. ব্যতিক্রমধর্মী শিশু। অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপক সারাওয়াতারা জামান। ২০১৪। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা। পৃষ্ঠা ১২৪।

২. নিরুপমা দেবী রচনাবলী। শ্যামলী। করুণা প্রকাশনী।২০০৪। পৃষ্ঠা ১৯৬

৩. ঐ পৃষ্ঠা ২০৭।

৪. ঐ পৃষ্ঠা ২২৯।

৫. ঐ পৃষ্ঠা ৩০৪।

৬. ওঙ্কার। আহমেদ ছপা। স্টুডেন্ট ওয়েজ। ঢাকা। ২০১৬।

৭. ঐ ৩২।

৮. সতীনাথ ভাদুড়ীর নির্বাচিত রচনা। পৃষ্ঠা ৭

৯. সুশীল জানার রচনাসমগ্র। একুশ শতক।২০১১। পৃষ্ঠা ১৮৩

১০. কালোঘোড়া। ইমদাদুল হক মিলন। ২০১৭। অভিযান । কোল। পৃষ্ঠা ৮

১১. ঐ পৃষ্ঠা ৯১।

১২. বনফুল রচনাবলী। ১৩ খণ্ড।

বাংলা সাহিত্যে শারীরিকভাবে অন্যতর সক্ষম : অবস্থান, পরিণতি

বাঙলা সাহিত্যে শারীরিক প্রতিবন্ধী অবস্থান, পরিণতি ও পুনর্বাসন

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়া মাসাদুর রহমানের কথা আমরা জানি, আমরা জানি নৃত্যশিল্পী সুধাচন্দনের কথা। কারণ এরা প্রত্যেকেই শারিরীক অক্ষমতাকে জয় করে নিজ নিজ ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কিন্তু কতজন এইরকম শারীরিক প্রতিস্পর্ধী মানুষ ইতিহাস তৈরি করতে পারেন। একজন পা-হীন মানুষকে সমাজ 'খোঁড়া' বলেই দেগে দেয়, একজন হাত হীন মানুষকে সমাজ চিহ্নিত করে 'নুলো' বলে, একজন শারীরিকভাবে বিকৃত মানুষ সমাজের চোখে 'পঙ্গু' মাত্র। আমরা একবারও ভাবি না যে এই ধরণের সম্বোধন ঐসব মানুষকে কতটা আহত করে, অপমান করে।

ভারতের ২০১৬ সালের সেনশাস রিপোর্টে কাদের শারীরিক প্রতিবন্ধী বলা হবে তার একটা নির্দেশনামা রয়েছে। সেটি হল—

'1. Do not have both arms or both legs; or

2. Are paralyzed and are unable to move but crawl; or

3. Are able to move only with the help of walking aids; or

4. Have acute and permanent problems of joints/muscles that have resulted in limited movement; or

5. Have lost all the fingers or toes or a thumb; or

6. Are not able to move or pick up any small thing placed nearby; or

7. Have stiffness or tightness in movement; or

8. Have difficulty in balancing and coordinating body movements; or

9. Have loss of sensation in the body due to paralysis or leprosy or any other reason; or

10. Have any deformity of the body part/s like having a hunch back; or

11. Very short statured (dwarf).' [১]

সাধারণত শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা—

ক. স্নায়বিক ক্ষতিজনিত

খ. অস্থিমাংসের ক্ষতিজনিত

গ. জন্মগত ত্রুটিজনিত

ঘ. দুর্ঘটনাজনিত শারীরিক প্রতিবন্ধকতা।

প্রাচীনকাল থেকে পৃথিবীর সব দেশের ভাষায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রসঙ্গ এসেছে। ভারতবর্ষের পুরাণ ঘাঁটলে দেখা যাবে অষ্টাবক্র মুনির কথা পাই যার লেখা উপদেশাবলী অষ্টাবক্র সংহিতা হিসেবে পরিচিত। মথুরার রাজবংশের পরিচারিকা কুব্জা বুড়ির প্রসঙ্গ রয়েছে যে কৃষ্ণের কৃপায় ভালো হয়ে যায়। ঋকবেদ সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩ নং সুক্তে ইন্দ্রকে স্তুতি করা হয়েছে যেহেতু তিনি অন্ধ ও পঙ্গুকে উদ্ধার করেছেন—

अरमयः सरपसस्तराय कं तुर्वीतये च वय्याय च सरुतिम |

नीचा सन्तमुदनयः परावृजं परान्धं शरोणं शरवयन स. उ. ||[২]

বাঙলা সাহিত্যে 'লোরচন্দ্রানী' কাব্যে রাজা বামনের প্রসঙ্গ রয়েছে। অবশ্য বামনকে এখানে খল চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। তবে দুএকটি কথা বললে বলা যায়, রাজা বামন কিন্তু বীরত্বে বা রাজ্যশাসনে দুর্বল ছিল না। শুধু তার শারীরিক অক্ষমতা তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে। কবি লিখেছেন—

'মহাবীর বামন সৃজিল প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরস নাহি মূঢ়মতি।। ...
প্রতিদিন মহাবীর কানন ভ্রমিয়া।
শার্দূল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া'।।[৩]

শারীরিক অক্ষমতার কারণে এই কাব্যের মূল সমস্যার সৃষ্টি। যেমন নপুংসক আয়ান ঘোষের জন্য রাধা আকৃষ্ট হয়েছিল কৃষ্ণের প্রতি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে পঙ্গুত্ব এসেছে রূপক তৈরির জন্য। শেষ লেখা কাব্যগ্রন্থের ৯ নং কবিতায় পঙ্গু শব্দটি এইভাবে প্রয়োগ করলেন—

'বিশ্বব্যাপী ধূসর সম্মানে
আজ পঙ্গু আবর্জনা
নিয়ত গঞ্জনা
কালের চরণক্ষেপে পদে পদে
বাধা দিতে জানে,'

রোগশয্যা কাব্যের নবম কবিতায় লিখলেন—

‘পঙ্গু উঠিতেছে কাঁদি নিদ্রার অতল-মাঝে,
আত্মপ্রকাশের ক্ষুধা বিগলিত লৌহগর্ভ হতে
গোপনে উঠিছে জ্বলি শিখায় শিখায়’।

শুধু কবিতা নয় গদ্য রচনায়ও তিনি ‘পঙ্গু’ শব্দটি ব্যাবহার করেছেন উপমা হিসেবে—

‘প্রাণীবিবরণে দেখা যায়, একজাতীয় জীব আছে যারা পরাসক্ত হয়ে জন্মায়, পরাসক্ত হয়েই মরে। পরের অঙ্গীভূত হয়ে কেবল প্রাণধারণমাত্রে তাদের বাধা ঘটে না, কিন্তু নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি ও ব্যবহারে তারা চিরদিনই থাকে পঙ্গু হয়ে। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা সেই জাতীয়’।[৪]

‘সমাজ’ গ্রন্থের ‘হিন্দু বিবাহ’ প্রবন্ধে তিনি প্রতিবন্ধীদের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—

‘উপহাস রসিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, যদি এমন করিয়া বাছিয়াই বিবাহ প্রচলিত হয় তবে সমাজে অন্ধ খঞ্জ কুৎসিত অঙ্গহীনদের দশা কী হইবে। মনুর আমলে অঙ্গহীনতা প্রভৃতি দোষ জন্য যে-সকল কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, তাহাদের দশা কী হইত। পিতামাতার উপরে নির্বাচনের ভার রহিয়াছে বলিয়াই যদি সমাজে অন্ধ খঞ্জ অঙ্গহীনরা পার হইয়া যায়, তবে এমন হৃদয়হীন বিবেচনাশূন্য নির্বাচন-প্রণালী অতি

ভয়ানক বলিতে হইবে ছেলেমেয়ের বিবাহ দিবার সময় পিতামাতা তাহাদের মঙ্গল আগে খুঁজিবেন, না সমাজের যত অন্ধখঞ্জদের সুখ আগে দেখিবেন?'

'আত্মশক্তি' গ্রন্থের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি প্রতিবন্ধীদের প্রতি ভারতবর্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বললেন—

'আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশ্যক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তুকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই এ দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-খঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই'।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্টিফেন হকিংকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি বলেছেন—

> 'অসুখের নাম মোটর নিউরোন, চিকিৎসা শাস্ত্রের অতীত
> একটার পর একটা অঙ্গ পঙ্গু করে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের গলা টিপে মারে
> তবু সেই একুশ বছরের যুবকটির মস্তিষ্ক সেই অসুখকে চ্যালেঞ্জ
> জানিয়েছিল

> তুমি আমার শরীরকে হারাতে পারলেও আমাকে জয় করতে পারবে না’[৫]

শরীরকে হারাতে পারলেও মানুষকে হারাতে না পারার লড়াই একজন শারীরিক প্রতিবন্ধীর লড়াই। বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাস বা ছোটগল্পে সে লড়াইের গল্প বারবার এসেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে যে চরিত্রটি শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্বেও এই উপন্যাসে বিশেষ স্থান নিয়ে রয়েছে সে হল কুবেরের বউ মালা। যদিও এই উপন্যাসের নায়িকা কপিলার মতো সে উজ্জ্বল নয়। তিন নম্বর পরিচ্ছদে মালার পরিচয় দিয়েছেন লেখক এইভাবে—

‘ কুবের ঝিমাইতে ঝিমাইতে নিদ্রাকাতর চোখে স্ত্রীর দিকে তাকায়। হ, ছেলে কোলে রোগা বউটিকে তাহার রাজরানীর মতো দেখাইতেছে বটে।...মালার রং কালো নয়, তামাটে— মাঝে মাঝে তাহাকে বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো ফর্সা দেখিয়া বসে। জেলেপাড়ার কোনো স্ত্রীলোকের গায়ে এমন চামড়া নাই। একটা পা যদি ওর হাঁটুর কাছ হইতে দুমড়াইয়া বাঁকিয়া না যাইত, কুবেরের ঘরে ও পায়ের ধুলা ঝাড়িতেও আসিত না’।

এই মালাকে সন্দেহ করে কুবের, যেহেতু কোলের ছেলেটির গায়ের রং ফর্সা হয়েছে, বেশি। আসলে মালাকে শরীরতৃষ্ণার গ্লাস মনে করেছে কুবের। তাই সংসারে হাজার অভাব অনটন থাকলেও বাচ্ছা জন্মদেওয়ার কাজে তার খামতি নেই কোনোদিন। এমনিতে

সমাজে মেয়েদের মূল্য ছেলেদের সমান নয়, তার উপর পঙ্গু হলে তো তার মূল্য কানাকড়ির দরে। লেখক তেমনি এক পরিচয় দিয়েছে মালার—

‘পঙ্গু বলিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে মালার পরিচয় কম। কেতুপুরের দশমাইল উত্তরে চরডাঙা গ্রামের এমনি এক ভাঙা কুটিরে তার মায়ের এক বামুন ঠাকুরের নামে কানাকানি করা পাপের প্রমাণ স্বরুপচ এই ভাঙা পাটি লইয়া সে জন্মিয়াছিল, বড় হইয়াছিল বাড়ির মধ্যে লাঠিতে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। বাড়ির অদূরে রাম গোয়ালার গোয়ালঘরের কাছে কদমগাছটি পর্যন্ত ছিল কষ্টকর গতিবিধির সীমা’।[৬]

প্রতিবন্ধীতা একটি অভিশাপ এই ধারণা গ্রাম্য সমাজে এখনো প্রবলভাবে বিদ্যমান। মালার ক্ষেত্রে সেটাই দেখতে পাই। শুধু তাই নয়, ভাইদের মারামারির হাত থেকে বাঁচাতে গেলে সেই মার খায়, তাকে ছুঁড়ে দেওয়া হয় গোবর গাদায়। এই মালা জেলে পাড়ার আর পাঁচজন মেয়ের মতো না। সে তার বাচ্ছাদের আগলে রাখতে চায় চোখে চোখে। কিন্তু ‘ছেলেদের সে ফিরিয়া পায় সন্ধ্যার পর। সারাদিন পড়ে পাখির ছানার মতো অবসন্ন ছেলে দুটি ফিরিয়া আসে ঘরের কোনায়, খোঁড়া মাকে তখন তাদের প্রয়োজন হয়।...মালার কাছে বসিয়া তাহারা ভাত খায়। ...মালার মাথায় উকুন,গায়ে মাটি, পরনে ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়, তাই এই সময়টা সে যে কত বড় নিখুঁত ভদ্রমহিলা, আস্মাঞ্জস্য তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়’।

খাওয়া হয়ে গেলে সে গল্প বলে ছেলেদের কাছে, রূপকথার গল্প। তার গল্প শুধু ছেলেমেয়েরা শোনে না। কুবের শোনে গল্প শুনতে আসে পাশের বাড়ির বউ ঝিরা, কেউ গল্পের মাঝে তাকে বাধা দেয় না। তাছাড়া 'একই গল্প বার বার বলিয়া শ্রোতাদের সে সমান মুগ্ধ করিতে পারে'।

আসলে একজন প্রকৃত গৃহ বধূ হওয়ার সবকটি গুণই তার রয়েছে, অন্তত জেলে পাড়ার বাস্তাবতা তাই বলে। কিন্তু শুধু প্রতিবন্ধী বলেই তার প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা হয়ে গেছে। এর প্রমাণও রয়েছে। মালার মেয়ে গোপী সে বিবাহযোগ্যা। যুগল নামের ছেলেটিকে তারা পছন্দ করে, কিন্তু যুগল স্পষ্ট করে এই বিয়েতে সায় দেয় না, কারণ কি? না কুবের জানায়—' খোঁড়ার মাইয়া নি খোঁড়া হয়'। কুবের কিন্তু প্রতিবাদ করে, খোঁড়া কি রোগ নাকি যে মায়ের থেকে মেয়ের হবে?

খোঁড়া স্ত্রীর প্রতি কুবেরেরও কি ভালোবাসা ছিল? অবচেতনে কি অতৃপ্তি ছিল না? কুবেরের মনে কপিলার প্রবেশ ঘতেছিল এই অতৃপ্তির কারণে। কারণ ' কুবেরের বিবাহের সময় বড় দুরন্ত ছিল কপিলা। তখন পঙ্গু মালাকে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়াই হয়তো কপিলার দুরন্তপনা অত বেশি চোখে পড়িয়াছিল কুবেরের,'। আর স্বামী পরিতক্তা কপিলার আগমনে এই ত্রিমুখী প্রেমের সুত্রপাত ঘটে কাহিনিতে, কারণ কুবের কিন্তু ' পঙ্গু বলিয়া সে কখনো মালাকে অনাদর করে নাই'।

মায়ের পঙ্গুত্ব মেয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় জ্যৈষ্ঠের ঝড়ের তাণ্ডবে। পা ভাঙ্গল গোপীর। সবাই ভেবে নিয়েছিল মালার মতো গোপীও বোধয় খোঁড়া হয়ে যাবে। যে রাসুর মনে গোপীকে বিয়ে করার বাসনা ছিল সেও পঙ্গু স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করতে পারবে কিনা চিন্তাগ্রস্ত হয়—' খোঁড়া বউ! হয়তো জীবনে কোনোদিন সে দাঁড়াইতে পারিবে না—যদি পারেও লাঠি ধরিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটিবে, পায়ের পঙ্গুত্বের জন্য দেহের হয়তো আর পুষ্টি হইবে না, চিরকাল কুৎসিত দেখাইবে তাকে'।

কিন্তু ডাক্তারের চিকিৎসায় গোপী সুস্থ হয়ে ঘরে ফেরে। আবার সে চলতে ফিরতে পারে আগের মতো, এটা দেখে জন্ম থেকে হাঁটতে অক্ষম মালার মধ্যে সাধ জাগে, কুবেরকে ডেকে বলে—' মনে এউককা সাধ ছিল মাঝি, কমু?' সাধটা আর কিছু না একবার সে হাসপাতালে গিয়ে গোপীর চিকিৎসককে নিজের পঙ্গু পা'টি সে দেখাতে চায়। মনে হয়তো কোথাও তার অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছিল। কপিলার মতো সে রকমসকম জানে না। পুরুষের মন তার জানা আছে। মনে মনে ভাবে—' কুবের কি বুঝবে খোঁড়া পায়ের জন্য কি দুঃখ মালা পুষিয়া রাখিয়াছে মনে'।

কিন্তু কুবের এ বিষয়ে আগ্রহ দেখায় না, তাই লোকের কানাকানিকে উপেক্ষা করে সে মেজবাবুর সঙ্গে গিয়ে হাসপাতালে গিয়ে পা দেখিয়ে আসে। যতই ডাক্তার বলুক গে তার পা সুস্থ হবার নয়, কিন্তু গৃহ বন্দী ,সংসার বন্দী মালা বাইরের জগত দেখে খুশি হয় মনে। কিন্তু এর জন্য তার দাম্পত্য জীবন অশান্তিতে ভরে যায়। হোসেন মিঞার ডাকে

সে অনির্দিষ্ট নতুন ভুবন খোঁজার জন্য কুবের বেছে নেয় পা বিশিষ্ট কপিলাকে। মালা পড়ে থাকে অন্ধকার জেলে বস্তিতে। এটাই এই উপন্যাসের চরম ট্রাজেডি।

শহরতলি উপন্যাসের চরিত্র ধনঞ্জয়। যার পায়ে ওয়াগন পড়ে গিয়ে ডান পাটি হাঁটুর তলা থেকে বাদ দিতে হয়। আর এর পর সে অস্তিত্বের সংকটে পরে। যশোদার প্রিয় মানুষ ধনঞ্জয়। দুজনের বড়সড় চেহারা। কিন্তু পা কাটা যাবার পর ধনঞ্জয় ঘরের বাইরে আসতে লজ্জা পায়। ‘ নিজের দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে অহোরাত্র কাঁদিতে চায় সেই সঙ্গে কাঁদাইতে চায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে’। [৭] দিনরাত মৃত্যু কামনা করে নিজের।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদূষক উপন্যাসে (১৩৬৬) এক বিকলাঙ্গ কুৎসিত দর্শন চরিত্রের আত্মকথা। উপন্যাসের শুরুতে কথক নিজেই নিজের দেহের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

‘আমার চওড়া চ্যাপ্টা নাকটা ওপরের পুরু পুরু ঠোঁটের সঙ্গে প্রায় সমতল। কানের তলার অংশটা মাথা নাড়লে ছাগলের মতো লটর-পটর করে। থুতনির বালাই নেই, প্রায় মুখের তলা থেকে সেটা নেমে গেছে গলার দিকে। দুহাতে ছটা করে আঙুল। গায়ের রং পুরোনো তামার মতো অদ্ভুত আর অস্বাভাবিক’।[৮]

জন্মের তিনদিনের মধ্যে মা মারা যায় কথকের। জন্মদাতা বাবা এই কুরূপ ছেলেকে দেখেও দেখত না। পাড়া প্রতিবেশীরা বলত ‘ওই তো ছেলের ছিরি, ওকে আর অত করে বাঁচিয়ে কী লাভ’। মুরারি নাম ছিল একসময়, কিন্তু কেউ এই নামে ডাকত না কথক কে।

নিজের বাবা ডাকত ‘পেত্নির ছানা’ নামে। কথক চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মার খেয়েও হাসতে পারতো। লিখেছে– ‘আমার শরীরটা যেন হাসির তার দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রের মতো—ঘা লাগলেই তাতে সুর উঠত’।

এহেন মুরারি চরিত্র কোলকাতায় পালিয়ে আসে ক্রিমিনালদের সঙ্গে ভিড়ে যায়। নাম হয় জলিল। পকেটমারি করতে গিয়ে ধরা পরে মার খেয়েও হেসে উঠত সে, জেল খেটেছে বহুবার। তারপর কাজ নেয় সার্কাসে। সার্কাসের ট্রপিজের খেলা দেখায় পদ্ম নামের যে মেয়েটি তার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে মার খায় ম্যানেজারের কাছে। রাধা নামের মেয়েটি তাকে চড় মারে, সেই রাগে তার ট্রপিজের দড়ি খুলে রাখে প্রতিহিংসার জন্য, কিন্তু নিজেও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে রেললাইনে মাথা দিতে যায়। আসলে সমাজের অবহেলার শিকার হয়েছে মুরারি। যে কোন মানুষ অবহেলা পেলে সমাজের পক্ষে মঙ্গল ডেকে আনে না। প্রতিবন্ধী বলে আমরা তো এই আচরণটা স্বাভাবিক মনে করি।

মতি নন্দী রচিত ছোটবাবু উপন্যাসেও একটি বামন চরিত্র রয়েছে। এই উপন্যাসে বামন দীপাঞ্জনের উত্থান পতনময় জীবনালেখ্য। জন্ম থেকেই সে খর্বকায়। কলেজে পড়ার সময় তার উচ্চতা মাত্র চার ফুট এক ইঞ্চি। লোকলজ্জার ভয়ে সে সদা ত্রস্ত। রাস্তায় সে দ্রুত চলাচল করে। পাছে কেউ তাকে দখে ফেলে। একটা হীনমন্যতা তাকে ঘিরে থাকে যেন। দীপাঞ্জনের দেহের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—

‘কপাল ও কানের ওপর ঝুলে আছে কোঁকড়া চুল। ঘন ভ্রুর নিচে গোলাকার বড় বড় চোখ... জামার মধ্যে থলথলে চর্বির নাড়াচাড়া হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছে। ওর কাঁধ বুক পেট কোমর সমানভাবে বর্তুলাকার। বস্তুত ওর ঊর্ধ্বাঙ্গ অনেকটা কাপড়ে আচ্ছাদিত ঢোলকের মতো দেখাচ্ছে। সে ওদের দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারে সকলের চোখ তার দিকে’। [৯]

সমাজের চোখে এইসব শারীরিক প্রতিবন্ধীদের কিরূপ বিদ্রুপ করা হয় তার উদাহরণ দিয়েছেন লেখক, রাস্তায় চলার সময় তার বন্ধুরা তাকে ঘিরে ধরে সম্মিলিতভাবে রিগিং চালায় —

‘সে জানে এখন পাশ কাটিয়ে যেতে গেলেই দুজন দুপাশে এসে তার হাত দুটি চেপে ধরবে। পিছন থেকে কেউ চুল টানবে, নয়তো জুতো দিয়ে তার গোড়ালিতে ঠোক্কর মারতে থাকবে, হাঁটু দিয়ে তার পাছায় ধাক্কা মারবে’।

‘বিদূষক’ উপন্যাসের নায়কের মতো দীপাঞ্জনেরও দর্শন হল অন্যকে খুশি করে আনন্দ পাও। তবে এই উপন্যাসে আলাদা প্রাপ্তি এই যে দীপাঞ্জনের বাবা মা খুবই স্নেহপূর্ণ আচরণ করেন ছেলের জন্য। ছেলের কথা ভেবেই বাড়ির কলিং বেল চার ফুট উচ্চতায় বসানো, দীপাঞ্জনের ঘরের সব আসবাব পত্র তার উচ্চাতার সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ। দীপাঞ্জনের মা উৎপলা দেবী ছেলের কথা ভেবেই বাড়ি করে উঠে গেছে কারণ পাড়া প্রতিবেশী, অন্য ভাড়াটিয়ারা সবাই মিলে পরিহাস করত। কেমন ছিল সেসব অত্যাচার?—

‘ওকে সব থেকে বেশি জ্বালাতন করে সমবয়সীরাই। দীপ যেন অন্য গ্রহের জীব এইভাবে সবাই তাকায়, ওর পিছু নিয়ে দেহ সম্পর্কে অপমানকর মন্তব্য করতে করতে হাঁটে, কেউ কেউ ঢিলও মেরেছে। বহুদিন দীপ বাড়ি ফিরে কেঁদেছে, স্কুলে যেতে চায়নি, অসুখের ভান করে শুয়ে থেকেছে। তিন বার স্কুল বদল করেছে শুধু এই জন্যই।... নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে সে স্বল্পবাক হয়ে গেছে’।

অথচ এই ছোটমানুষটির একটা সুস্থ স্বাভাবিক মন আছে। রাস্তায় আলাপ আর এক পোলিও রোগক্রান্ত প্রতিবন্ধী মণির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে স্বাভাবিক ভাবে। এই মেয়েটির জীবনও খুব একটা আশাপ্রদ নয়, চলাচলের অসুবিধার কারণে সে স্কুলে যেতে পারে না। মণিকে ভালো লাগার কথা মুখ ফুটে বলতেও পারে না দীপাঞ্জন। শুধু তাই নয় লোকে যখন তাকে দেখে হাসাহাসি করে তার কি খারাপ লাগে না ? বন্ধু প্রশান্ত যখন এই প্রশ করে তখন উত্তরে দীপাঞ্জন বলে—

‘না, আমার অপমান লাগে না। দুঃখও লাগে না। আমার এই শরীর তো আমি বানাইনি। ভগবান করে দিয়েছেন। অপমান যদি কারুর হয় তো তারই হবে।... সে চেয়েছে মজা দিতে, ছোটবাবু হয়ে আনন্দ দিতে। আমি তাই করব সারাজীবন’।

এটা জীবনদর্শন না একজন মানুষের হাজার প্রতিকূলতার মধ্যে গড়ে ওঠা আপোষ সিদ্ধান্ত আমাদের গুলিয়ে যায়। অথচ দীপাঞ্জনের মা ছেলের চিকিৎসার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু খরচের ভারে তা থেমে গেছে মাঝ পথে, দিপাঞ্জন মেনে নিয়েছে নিজের জীবনের বাস্তব

স্ত্যকে। খেলাধুলায় তার কোন ভূমিকা থাকে না, নাটকের দলে তার পার্ট জোটে বাচ্চা ছেলের। তার সহপাঠী বা সহপাঠিনীরা তাকে পুরুষ গোত্রে ফেলে না। ‘তাকে পুরুষ মানুষ রূপে নীরেনদা গ্রাহ্যই করেনা এবং এই মেয়েরাও। তার কাছে মেয়েরা নিরাপদ একথা যে কোনো যুবকের কাছে লজ্জার। ওড়া ধরেই নিয়েছে তার ইচ্ছা তার প্রয়োজন তার শরীরের মতই ছোটখাট এবং সেগুলো যথেষ্ট নয় পুরুষ হয়ে ওঠার জন্য’।

এ হেন প্রতিমুহূর্তে প্রতিস্পর্ধী হয়ে বেঁচে থাকা মানুষটির করুণ পরিণতি আমরা দেখি। তার পরিণতির জন্য দায়ী আমদের পচে যাওয়া গলে যাওয়া সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি। নীরেন ও তার বান্ধবীদের সঙ্গে পিকনিকে যায় দীপাঞ্জন। সেখানে মেয়েদের প্ররোচনায় গাছে উঠে ডাব পারতে গিয়ে পরে যায় নিচে। সমাজের চোখে পুরুষ হয়ে উঠতে চেয়েছিল সে, তাকে প্ররোচিত করেছিল না পুরুষ অপমান। সে বন্ধুত্ব চেয়েছিল মেয়েদের বিনিময়ে পেয়েছে ইটের আঘাত। আর এই ভাবে নির্মম পরিণতি হয় একজন সুন্দর মনের অধিকারি পরিপূর্ণ এক মানব সন্তানের।

সন্তোষকুমার ঘোষের ‘সুধার শহর’(১৯৭০) উপন্যাসটি মনস্তাত্বিক এক আখ্যান। পঙ্গু নূপুর আর তার মায়ের মধ্যে এক ঠাণ্ডা সম্পর্কের গল্প। ডাক্তারের সঙ্গে পঙ্গু নূপুরের মায়ের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার তাগিদে ডাক্তার বা নূপুরের মা চায় না নূপুর সুস্থ হয়ে উঠুক। যতদিন নূপুর পঙ্গু থাকবে ততদিন অজুহাত পাবে ডাক্তারের আসা যাওয়ার। মেয়ের সুস্থ হয়ে ওঠার চেয়ে মায়ের দেহের চাহিদাকে নির্মম বাস্তব করে দেখানো হয়েছে এই উপন্যাসে।

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এসো নীপবনে(১৯৬১) উপন্যাসটি এক বিকলাঙ্গ কবির জীবনকথা। অবনী নামের এই কবির সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৌদির সঙ্গে। জীবনে পাওয়া দুঃখ যন্ত্রণার একমাত্র ভোলার রাস্তা ছিল এই অবৈধ প্রেম সম্পর্কে। কিন্তু বৌদি গর্ভবতী হওয়ায় আত্মহনন করে অবনী।

বিমল মিত্রের একটি অদ্ভুত সুন্দর উপন্যাস আমি(১৯৭২)। খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়, এই উপন্যাসে লেখক এটাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। আরনেস্ট হেমিংওয়ের ‘ দি ওল্ড ম্যান এন্ড দা সি’ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আড়াই খানা, জ্যোতির্ময়, নুটুবিহারী ও ভেড়া বৈকুণ্ঠ। বড় লোকের ছেলে জ্যোতির্ময় বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। ট্রেন থেকে নেমে ময়নাডাঙ্গা স্টেশনে নেমে গাছের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে। সেখানেই নুটুর সঙ্গে আলাপ। নুটু তাকে গরুর গাড়িতে করে বাড়ি নিয়ে আসে। জ্যোতির্ময়ের জবানিতে এই উপন্যাসটি রচিত। সে লিখেছে—‘এতক্ষণে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। নুটু খোঁড়া। খোঁড়া মানে দুটো পায়ের পাতা দোমড়ানো’। [১০]

নুটুর একমাত্র সঙ্গী বৈকুণ্ঠ। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। নিজে না খেয়েও বৈকুণ্ঠকে সে খাওয়ায়। সন্তানের মতো। এমনকি বৈকুণ্ঠ অবলা প্রাণী হলেও তার পালন কর্তা যে প্রতিবন্ধী সে জানতো। তাই ‘নুটুর পাটার দিকে চেয়ে দেখতো। যেন নুটুর খোঁড়া পা’টার জন্যে তার মনে মায়া হতো। দেখছে যখন কেউ কোথাও নেই, তখন বৈকুণ্ঠ চুপি চুপি নুটুর খোঁড়া পা’টা জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছে’।

ইটের ভাঁটায় কাজ করে মাঝে মধ্যে নুটু, বলে যে শুধু বৈকুণ্ঠের জন্যে খেটে খেতে হচ্ছে। নইলে চলে যেত কোথাও। যে ভেড়ার জন্য এত কিছু সেই ভেড়াটিকে বিক্রি করে দেয় নুটুর বাবা কসাইয়ের কাছে। নুটু গিয়ে ছাড়িয়ে আনে। অথচ বন্ধু অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার জন্য সে নিজে গিয়ে ভেড়াটি বিক্রি করে দেয়। এই ঘটনার অনেক পরে এই গল্পের কথক জ্যোতির্ময় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এসেছে নুটুর গ্রামে। এবং ময়নাডাঙ্গা গ্রামে এসে নুটুর খোঁজ করেছে, পায়নি। চিরকালের মতো নুটুরা শোষিত হতে হতে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

আবুল বাসারের 'স্পর্শের বাইরে'(১৯১৫) নামে একটি উপন্যাস আছে যার প্রধান চরিত্র ঈশানচন্দ্র। গরীব পরিবারের সন্তান সে। তার সম্পর্কে লেখক বলেছেন—'ওর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত শেলেট আর বইয়ের ব্যাগ। গলায় সেই সব ঝোলাতে ঝোলাতে ঈশান স্কুল যেত হামা টেনে, কারণ ওর পা দুখানি ছিল নষ্ট। সরু লিকলিকে। এবং হয়তো বা মৃত। হাঁটুর দুইটি চাকি পথশ্রমে কালো হয়ে দড়কচা মতন দেখাতো। খস খসে, শুষ্ক দড়'।[১১]

মানুষের এই চলন থেকে আমরা দুটি বিষয় বুঝতে পারি হাজার প্রতিবন্ধকতা সত্বেও ভেতরের গড়ে ওঠার খিদে সকলের নষ্ট হয় না। লেখক ঈশানচন্দ্রের মধ্যে সেই সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। প্রতিবন্ধী শব্দ এখানে কাজ করেনা, এরা অন্যভাবে সক্ষম, কিংবা প্রতিস্পর্ধী। জাতিতে চামার হলেও সে নিজেকে তৈরি করেছে সাধারণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে। একদিকে অস্পৃশ্যতা, অন্যদিকে প্রতিবন্ধকতা এই দুইভেবে পেষিত হয়েছে

ঈশান। তার জীবনে প্রেম এসেছিল। প্রথমে স্যারের মেয়ে প্রণতি এবং পরে আবৃত্তি শিল্পী অপূর্ণা। অপূর্ণা জীবনে সম্ভোগ চায়, স্বাধীনতা চায়। প্রতিবন্ধী ঈশানকে সে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সে বহু ভোগ্যা। একদিন ধরা পরে ঈশানের কাছে। বর্ষার দিনে একদিন প্রেমের জন্য স্ত্রীর খোঁজ করে ঘরে ঢুকতে গিয়ে স্ত্রীর যৌন সম্ভোগের শীৎকার শোনে। শোনে—' মুচিটা আমাকে আনন্দ দিতে পারেনি গো। জানতামই না, এই শরীর কি!'

উপন্যাসের শেষে এক পরাজয়ের গল্প। 'এক ভোরে, অপূর্ণার পাশ থেকে খাট থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় ঈশান; যেভাবে ঘুমের ,মধ্যে জগু দাসের দাওয়া থেকে সে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিল একদা—তারপর আর সে উঠতে পারে না; হাতের লাঠিটা ঘুমন্ত অপর্ণার পাশে ঘুমিয়ে থাকে। ঈশানচন্দ্র আর কিছুতেই উঠে দাঁড়াতে পারে না, ধসে যায়, হামা টানে মেঝেয় এবং সেই বকুল গন্ধ মাখা প্রত্যুষের আঁধারে সরীসৃপ হয়ে যায়'।

প্রতিবন্ধী অথচ খুব জনপ্রিয় চরিত্র যদি বাঙলা সাহিত্যে কেউ থাকেন তিনি হলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকা বাবু। আসল নাম রাজা রায়চৌধুরী। তিনি ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা। একবার আফগানিস্তানে কামাল নামে এক বন্ধুকে দুর্ঘটনার কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে একটি পা গুঁড়িয়ে যায়। সব গল্পেই কাকাবাবুর সঙ্গী ক্রাচ। এই ক্রাচকে অনেক ক্ষেত্রে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করেছেন তিনি।

কিছুদিন সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের উপদেষ্টা ছিলেন। সেখানকার কর্তা নরেন্দ্র ভার্মা তাঁর বিশেষ বন্ধু। এই নরেন্দ্র ভার্মা তাঁকে অনেক ব্যাপারে সাহায্য করেছেন।

কাকাবাবুর সব অভিযানের সঙ্গী ভাইপো সন্তু ওরফে সুনন্দ রায়চৌধুরী। অধিকাংশ অ্যাডভেঞ্চার ভারতের বিভিন্ন জায়গা বা বিদেশে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মোট ৩৬টি উপন্যাস ও ৬টি গল্প লিখেছেন কাকাবাবুকে নিয়ে। কাকাবাবু শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী হলেও তাঁর অদম্য সাহস, মনের জোর ও নানা বিষয়ে অভূতপূর্ব জ্ঞান কাকাবাবুর সব ক্ষেত্রে জয়ী করেছে ।

আসলে কাকাবাবু গোয়েন্দা চরিত্র হওয়ায় তাঁকে বানানো হয়েছে অতিমানবের মতো। কিন্তু ভালো করে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাকবাবুর কোনো অভিযানেই কোনো অবাস্তব ক্ষমতার প্রকাশ দেখা যায় নি। চলনে অক্ষম মানুষেরা এখন সব কিছুই করতে পারছে। তারা ইংলিশ চ্যানেল থেকে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় সব কাজেই সমান দক্ষতায় এগিয়ে চলেছে। তবে কাকাবাবুর এই প্রতিবন্ধকতা কিছু ক্ষেত্রে যে বিপদ ডেকে আনে নি বা অসুবিধা সৃষ্টি করেনি তা বলতে পারি না। কখনো ব্যাল্যান্স রাখতে না পেরে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পরেছেন, কখনও শত্রুদের ধরতে পারেন নি, কখনো বন্দী হয়েছেন। চশমা ছাড়া তিনি দেখতে পান না এটাও একধরণের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। কাকাবাবু চরিত্রটি সৃষ্টির প্রেরণা যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন তার জাজেভাবেই তা বলা যায়—

'একবার আমি একজন খোঁড়া মানুষকে খুব উঁচু পাহাড়ে উঠতে দেখেছিলাম। তাঁর যেন একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। তখন আমি ছোট, সন্তুরিই বয়সী। সেই মানুষটিকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, অসাধারণ তাঁর মনের জোর, আর এরকম মনের জোর থাকলে মানুষ যে-কোনো বাধাকেই জয় করতে পারে। সেই মানুষটি কাকাবাবু'। [১২]

কাকাবাবুর সম্পর্কে সন্তু বলেছে—'ক্রাচে ভর দিয়েও কাকাবাবু কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু'হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না'। কাকাবাবু বহু পাঠকের শুধু অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেয় না, তিনি প্রেরণা জোগান বহু মানুষের।

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস চতুষ্ক 'উত্তরাধিকার', 'কালপুরুষ', 'কালবেলা' ও 'মৌষলকাল'। এই উপন্যাস চতুষ্কের প্রধান চরিত্র অনিমেষ মিত্র। ডুয়ার্সে জন্ম। পরবর্তীকালে তার দাদু সরিৎশেখর মিত্র জলপাইগুড়ি শহরে বাড়ি করলে সেখানেই তার পড়াশোনা । ১৯৬০ এর দিকে-কলেজে পড়ার জন্য কোলকাতায় পড়তে এলে ঐদিনই পুলিশের গুলিতে আহত হয়। এক বছর পর স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয় সে। কিছুদিন সিপিএম করলেও আদর্শগত মতভিন্নতায় যোগ দেয় নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে। এর মধ্যেই তার সাথে পরিচয় হয় মাধবীলতার। তারা পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলে। অনিমেষ নকশাল আন্দোলনের জেরে ধরা পড়ে। জেলে তার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করা হয় সে হাঁটাচলার সক্ষমতা হারায়। 'কালবেলা'র তৃতীয় খণ্ডে অনিমেষ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কোমরের তলা থেকে শরীরের বাকি অংশ আর কাজ করছে না। মুখে একরাশ দাড়ি, চুল খোঁচা খোঁচা, দুহাতে ভর করে লেংচে লেংচে এগোতে হয়। ক্রমশ পা দুটো সরু হয়ে আসছে।... অনিমেষের মাঝে মাঝে তাই মনে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনো পার্থক্য নেই। এ ভাবে লেংচে লেংচে পাছা ঘষটানি দিয়ে চলেছে দেশটা'। [১৪]

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে অনিমেষ ভেবেছিল প্রতিবন্ধীদের আশ্রমে চলে যাবে। কিন্তু মাধবীলতাকে পেয়ে, ছেলে অর্ককে পেয়ে তার দর্শন পাল্টে যায়—' এই ঘরে বসে সে নিঃশব্দে লড়াই করে যেতে পারে। শুধু সেই লড়াইয়ের জন্য তাকে মনে মনে প্রস্তুত হতে হবে'। তবু নতুন পাতা সংসারে ছেলে অর্কের সঙ্গে কর্মহীন অনিমেষের খিটিমিটি লেগেই থাকে। তবু এর মধ্যেই বাঁচার রসদ খোঁজে অনিমেষ। ছেলে অর্কের মধ্যে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে সে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রটা অনেক বিরাট। যেহেতু খণ্ড জীবনকে সেখানে তুলে ধরা যায় সেহেতু বহু গল্পে মূল চরিত্র রূপে কিংবা পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে শরীরগত অন্যতর সক্ষম চরিত্রেরা এসেছে। গিরিবালা দেবী(১৮৯১) রচিত 'পথহারা' গল্পটি ব্যর্থ প্রেমের হলেও একটি বার্তা রয়েছে। সলিল ও জয়া পারস্পরিক বন্ধু বাল্যকাল থেকে। পাশের গ্রামের জমিদারের মেয়ে লক্ষণার সঙ্গে সলিলের বিয়ে ঠিক হলে সলিল আপত্তি করে, কারণ পাত্রীর একটি পা খোঁড়া। সলিলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করায় জয়া। সলিল জয়াকে প্রার্থনা করে, জয়া সলিলকে ভালবাসলেও রাজি হয়নি, কারণ সে বিধবা। শেষ পর্যন্ত লক্ষণার সঙ্গে বিয়ে হয় সলিলের, এবং সে জয়ারও প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বেশ কিছু নেতিবাচক গল্প রয়েছে। এই সব গল্পে এমন কিছু চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে যাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা জনিত কারণে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি হয়েছে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নারী ও নাগিনী'

গল্পের খোঁড়া শেখ বা তিনশূন্য গল্পের লালা; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাগৈতিহাসিক' গল্পের ভিখু, 'তারপর' গল্পের গজেন মালি, প্রভৃতি।

নারী ও নাগিনী গল্পে খোঁড়া শেখ সাপুড়ে। অনন্তনাগের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা স্ত্রী জোবেদার সহ্য হয় না। শেষে সাপের কামড়ে স্ত্রীর মৃত্যু হলে খোঁড়া শেখ ফকির হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পরে অজানার উদ্দেশ্যে। 'তিন শূন্য' গল্পের চরিত্র লালার জন্ম হয়েছিল বিকৃতকাম পুরুষের ঔরসে। সে নিজেই বিকৃত শরীর ও মানসিকতার কারণে সমাজ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু শরীরের জৈবিক খিদে তার প্রবল। যৌনতার তাড়নায় সে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, নারী শরীর তার চাই। আর এই শরীর খোঁজার তাড়নায় সে এক অসহায় নগ্ন কিশোরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের গল্পে সবসময় একটা মনস্তাত্বিক প্রেক্ষাপট। মানুষের আদিম সত্তাকে তিনি অনাবৃত করে দিয়েছেন তাঁর গল্পগুলিতে। 'তারপর' গল্পের মূল চরিত্র গজেন। ছোটবেলায় তার মা কাণকালি গ্রামের খালে যে কুমির এসেছিল সেই কুমিরের মুখ থেকে সন্তানকে বাঁচাতে পাড়ের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেই ছোট ছেলেটি এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। শুধু তাই নয়—' টেরা বাঁকা আধ শুকনো বাঁ হাতটা একেবারেই অকেজো, আঙুলগুলি শক্ত হয়ে গেছে, বাঁকে না।... এই বয়সেই দড়ির মতো পাকিয়ে দেহের মাংসপেশিগুলি তার শক্ত হয়ে গেছে, রোগা শরীরটাতে শক্তি আর সহিষ্ণুতা আশ্চর্যরকম।... আর কো ভীরু তার দুটি চোখ! সবাই যেন যখন তখন তাকে মারে,

আপন পর ছোট বড় দেবতা মানুষ নারী পুরুষে যে যেখানে আছে। নিরুপায় সহনশীলতায় সে যেন চুপচাপ সয়ে যায়। অসহ্য হলে অন্তরালে কাঁদে।'[১৫]

প্রতিবন্ধকতা সত্বেও গজেন পড়াশোনা করেছে। প্রাথমিক শেষ করলেও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার আগে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়ে সে স্কুল ত্যাগ করে। বেশিরভাগ সময় পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়েছিল, কিন্তু পঞ্চম শ্রেণিতে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে প্রথম হয়েছিল। পড়াশোনায় এই সাফল্য ছাড়াও গজেনের ছবি আকাঁর হাত ছিল—

' ড্রয়িংএ তার হাতটা ছিল পাকা। একহাতে এত সহজে এত ভালো ড্রয়িং সে করতে পারতো যে, অন্য ছেলেরা হাঁ করে চেয়ে থাকতো। ড্রয়িং মাস্টারের চেয়ে তার আঁকা পাখী ও গাছ জীবন্ত হত বেশি।'[১৬]

এ হেন গজেন নারী পাচারকারী। শুধু পাচার নয় সে নারী লোলুপও বটে, নিজের ভাগ্নির প্রতিও তার লোভ। দুর্ভিক্ষের সময়ের ফসল হল এই গজেন। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ও অভাব এই দুটোকে জয় করতে সে অন্ধকারের পথকে বেছে নিয়েছে। তবু বলব বিকল্প জীবনের পথে সে সফল একজন মানুষ।

প্রাগৈতিহাসিক গল্পের ভিখু, পূর্ব জীবনে ডাকাত ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে বর্শার আঘাতে সে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। মনের মধ্যে তার আদিম ক্ষুধা। জখম অবস্থায় সে তার আশ্রয় দাতা প্রেহ্লাদের বউকে আয়ত্বে আনতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। এহেন ভিখুর এই আদিম প্রবৃত্তির গল্প নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক। আদিম মানুষের মতো তার চাহিদাগুলো আদিম। তার ভিক্ষুজীবন শুরু হয়েছে অদ্ভুতভাবে। ভিখু একদিন বাজারের এক ব্যক্তির কাছে সাহায্য

প্রার্থনা করলে ব্যক্তিটি ভিখুর—‘ মাথার জটাবাঁধা চাপ চাপ রুক্ষ ধূসর চুল, কোমরে জড়ানো মাটির মতো ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া, আর দড়ির মতো শীর্ণ দদুল্যমান হাতটি’ দেখে তাকে একটি পয়সা দেয়। আর এই ভাবেই সে ‘ পৃথিবীর বহু পুরাতন ব্যবসা’ ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করে। অসহায় জীবন যাপনের মধ্যে ফ্রয়েড কথিত ‘লিবিডো’ দ্বারা সে চালিত হয়েছে। যৌন লালসা ছাড়াও পৃথিবীর সব নারীকে ভোগ করা, সংসার করার স্বপ্ন সে দেখত। ভিক্ষা করতে গিয়েই পরিচয় হল পাঁচী আর বসিরের সঙ্গে। পাঁচীর একটি পায়ে দগদগে ঘা, আর বসিরের পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। এই পাঁচীকে অধিকার করার তার মধ্যে উদগ্র বাসনা জাগে। পাঁচীকে চুরি করে খাবার খাওয়ানো, খুশি করার বাসনা জাগে। আর এই কাজে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে বসির। সেজন্য রাতের অন্ধকারে খুন করে বসিরকে। এ জন্য তার মধ্যে কোনও অপরাধ বোধ জন্মায় নি বরং সে গর্ব বোধ করে কৃত কর্মের জন্য—

‘পাঁচী আলো জ্বালিলে ভিখু পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের কীর্তি চাহিয়া দেখিল। একটিমাত্র হাতের সাহায্যে অমন জোয়ান মানুষটাকে ঘায়েল করিয়া গর্বের তাহার সীমা ছিলনা’। [১৭]

মানিকের ‘মীমাংসা’ গল্পে ‘খোঁড়া মেয়ে’ বিভার কথা রয়েছে। বিভা খোঁড়া বলে তার বাবা নগেন মেয়ের বিয়ে দিতে চায় এমন এক পাত্রে যে টাকার লোভে বিভাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। এই খানে বিভার মূল প্রতিবাদ। সে কেন টাকার বিনিময়ে অন্যের স্ত্রীর হবে। পরামর্শের জন্য সে কাগজের সম্পাদক পঙ্কজ কাছে আসে। টাকার অভাবে

পঙ্কজের কাগজ বন্ধ হতে বসেছে। সে নিজেই চিন্তিত কাগজের ভবিষ্যৎ নিয়ে। তাই বিভার সমস্যায় সে প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও পরে তাকে বাবার ঠিক করা পাত্রে বিয়ে না করার পরামর্শ দেয়। শেষ পর্যন্ত কাগজ বাঁচানোর জন্যে সে বিভাকে বিয়ে করতে চায়, কারণ যৌতূকের টাকায় সে কাগজটা বাঁচাতে পারবে। বিভা যখন বলে—' কিন্তু আপনার যে খোঁড়া কুচ্ছিত বউ হবে!' পঙ্কজ বেলে—' তা হোক না। কাগজটা বাঁচাতে পারলে খোঁড়া বউয়ে আমার আপত্তি নেই'। গল্পের নাম 'মীমাংসা'। সুতরাং নামের অর্থ শেষে এসে স্পষ্ট হয়েছে। টাকার লোভ আর আদর্শ এই দুইয়ের সংঘাতে আদর্শের জয় হয়েছে।

চারুচন্দ্র চক্রবর্তীর(১৯০২-১৯৮১) 'পা' গল্পে রয়েছে এক সৈনিকের গল্প। এই গল্পের নায়ক রমেনের যুদ্ধে আঘাত পেয়ে একটি পা বাদ দিতে হয়। নকল পা আর ক্রাচ সম্বল করে গড়ে ওঠে তার নতুন জীবন। কিন্তু আমাদের সমাজের পুরাতন মানসিকাতার কারণে রমেনের এই নতুন জীবনের তার সহায় হওয়ার বদলে তার আত্মীয় পরিজন তাকে আলাদা এক নিঃসঙ্গ জগতের বাসিন্দা করে দেয়। তার মা, বাবা, ভাই, বোন সবাই। তার প্রেমিকা তাকে মেনে নিতে পারেনা। সবাই তাকে একটা বাতিল হওয়া শেষ হয়ে যাওয়া মানুষ ভাবতে থাকে। আর সকলের কাছে এই অপ্রত্যাশিত আঘাতের ফলে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে যায় রমেন। তাই একদিন মাঝরাতে সে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পরে। কোথায় যাবে সে জানে না, শুধু সে এমন একটা দেশে যেতে চায় যে দেশে ' তার এই পায়ের দিকে চেয়ে কেউ কাঁদবে না, বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলবে না, ভয়

পাবে না’। প্রতিস্পর্ধী মানুষদের সামাজিক বয়কটের ফলে তাদের একাকীত্বের অসহায়তার এক নির্মম চিত্র এই গল্পে তুলে ধরেছেন লেখক।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী(১৯১২-১৯৮৩) ‘সামনে চামেলি’ গল্পে প্রতিবন্ধী এক সাতাশ বছরে পা রেখেছে এমন যুবকের কাহিনি ফুটে উঠেছে। গল্পটি আত্মকথনমূলক। গরীব হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বাপের বড়ো ছেলে সে। যে কিনা লেখাপড়া- শিখে একদিন মানুষ হবে, জগৎসংসারে সেবা করবে-, মানুষজন ধন্য ধন্য করবে; কিন্তু তা হয়নি। রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে একটা পা বাদ দিতে হয়। নিজের সম্পর্কে সে বলেছে—

‘ ক্রাচ ভর দিয়ে তাকে হাঁটতে হয়। হু, আমাকে। যে জন্য আমার হাঁটা খুব মন্থর। দুটো সুস্থ পা নিয়ে আপনারা যারা যত তাড়াতড়ি চলতে পারেন আমি পারি না’। [১৮]

সে খুব ভীরু, লাজুক, নির্জন রাস্তায় চলতে সে ভালোবাসে । রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দেখে আর রাস্তার মধ্যে জীবনের সূত্রভেদ খোঁজে। যদিও তার একটা চাকরি আছে প্রাইমারি স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে পড়ানোর। চাকরিটাও জুটিয়ে দেয় বন্ধুর বাবা প্রভাবশালী মানুষ হওয়ার দরুন। একশ কুড়ি টাকার সঙ্গে আরো দুটো টিউশনি, তাতেই বুড়ো বাবা য়ে সংসার।মা ও তিন ভাইবোনকে নি- তার ছাত্ররা ভাবে—‘ স্যার বেশিদিন বাঁচবে না,’... ‘ স্যার বিয়ে করেনি , কাটা পা নিয়ে কোনোদিন বিয়ে করতে পারবে না’ । সংসার দেখাশোনা ছাড়া তার আর কোনো স্বপ্ন নেই, স্বপ্ন থাকতেও নেই। যদিও কলেজে ঢোকার আগের বছর সাতআটটা কবিতা লেখে-; কিন্তু সেগুলো কোথাও ছাপতে দেয়নি, হয়তো জীবনটা কবিতার মতো ছন্দময় হয়নি। আজ তার আশা নেই, ভালোবাসা নেই,

সব হারিয়ে গেছে শুধুই করুণাপ্রার্থী সে। গায়ের জামাকাপড় পুরনো মলিন। গরিবি - চেহারার মানুষ। রোগগ্রস্তআশাহীন সাতাশ বছ-অপুষ্টি এবং স্বপ্ন-রের এক যুবক সে। অথচ সৌন্দর্যের প্রতি তার ভয়ংকর টান। ফুলের প্রতি টান। অভিজাত পাড়ায় সে সুন্দর সুন্দর মানুষ দেখে। এমনি এক নেশায় মাধবীলতা ছাওয়া এক বারান্দার সুন্দরী নারী দেখে সে মুগ্ধ হয়। কিন্তু সে নারী তাকে ভিক্ষাপ্রার্থী ভেবে বসে। প্রথমে টাকা ছুঁড়ে দেয়, পরে পুরানো জামাকাপড় দিয়ে সাহায্য করতে চায়। এতে সে ক্ষুব্ধ হয়। আর তাই নতুন ফোটা চামেলির জন্য সে এগিয়ে চলে। হতাশার ভেতর দিয়ে গল্পটি সমাপ্ত হলেও মধ্যবিত্তের টানাপড়েনের একটা চিত্র জলছবির মতো উঠে এসেছে এখানে। জ্যোতিরিন্দ্রের 'পঙ্গু' গল্পেও শুভেন্দু নামের চলনে অক্ষম ছেলেটি এমন এক মানসিক গুণ সম্পন্ন। প্রকৃতি ও শুভেন্দু যে এক হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে থেকে প্রকৃতির সব কটি রূপ সে অনুভব করে।

এই লেখকের 'নদী ও নারী' গল্পটি একসময় পাঠক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই গল্পের মূল বিষয় একটি মেয়েকে ঘিরে। সে ' ফ্যাশনের ফানুস', যেন সত্যি এক চিতাবাঘ। সে গান গায় বন্দুক চালায়। তাকে দেখে পদ্মার চরে বেড়াতে যাওয়া দম্পতি সুরপতি ও নির্মলা ভেবেছেলি বুঝি কোন 'তয়ের মেয়ে'। কিন্তু ভুল ভাঙ্গল তখন যখন জানতে পারলো পঙ্গু ও অন্ধ স্বামীকে ভালো রাখার জন্য সে ডাক্তারের পরামর্শে তিন বৎসর নদীতে ভেসে আছে । গল্পটি একটি মেয়ের আত্মত্যাগের গল্পের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মিতার গল্প।

সৈয়দ মুজতবা সিরাজের গল্প 'জুলেখা'য় একটি চরিত্র আছে বদরু নামে। সে মিলিটারিতে বাবুর্চির কাজ করত, জাপানিদের গুলি লেগে একটি পা চলে যায়। সে হাটে খাসির মাংস বিক্রি করে, সরকারি পেনসন পায়। অথচ তার সঙ্গে যখন জুলেখার বিয়ের কথা ওঠে জুলেখার মা বলে—' মেয়েটা তোমার গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে তো? ..নৈলে কোন আক্কেলে তুমি ওই আধবুড়ো ল্যাংড়া-ভ্যাংড়া লোকের সঙ্গে বাড়ি ঠেলতে চাইছ?' [১৯]

দেবেশ রায়ের বেশ কিছু গল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধকতার গল্প রয়েছে। 'বত্রিশ আঙুলে' গল্পের চরিত্র শ্রীশ গাঙ্গুলির দুহাতের বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে দুটি করে অতিরিক্ত বুড়ো আঙুল থাকায় পাড়ার লোকজন তাকে অপয়া মনে করে। শারীরিক ত্রুটি একজন মানুষের জীবনে জন্ম দেয় হীনমন্যতার। 'পা' গল্পে এক বাড়ির দুটি বউ আত্মহত্যা করতে গেলে বড়ো বউ মারা জায়,কিন্তু ছোট বউ বেঁচে গেলেও একটি পা কাটা যায়। যখন পা ছিল তখন সংসারের অভাবগুলো বড় মনে হত। কিন্তু পা বাদ যাবার পর ক্রাচসঙ্গী জীবনে অভাবগুলো আর খুব বেশি কষ্টের মনে হয়না। মনস্তাত্ত্বিক গল্প ' আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা' রয়েছে পঙ্গু স্বামীর দৈহিক শীতলটার কারণে স্ত্রী তটিনী দেওর শিশিরের প্রতি কামনা জানিয়েও সমর্পণ করতে না পারার বেদনা। মাঝখানের দরজায় কোন বাধা নেই, কিন্তু মনের বাধা ঠেলে সে এগোতে পারে না।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটায়ু' গল্পটি প্রতিবন্ধকতার এক করুণ গল্প। ট্রেন থামাতে গিয়ে এই গল্পের মূল চরিত্র নিত্যচরণের দুটি হাত কনুই থেকে বাদ যায়। সেই কাটা হাত নিয়ে সে জীবিকা অর্জন করে বাঁচতে চায়। সে বলে—' বউ ঠুঁটা হইয়া আমি

রাস্তায় বাইর হইতে পারুম না। নিত্যচরণ সেদিন বুক চাপড়াতে পারল না’। কাটা হাতের নিত্যচরণকে জটায়ু পক্ষির মতো দেখায়। কালিপুজার সন্ধিপূজায় সে নাচ দেখায়। চারদিকে আগুন জ্বালিয়ে, মুখে আগুনের মালসা নিয়ে তার আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার কসরত দেখার জন্য ভিড় হয়। ঢাকের তালে নিত্যচরণ নাচে আর বলির ছাগলটা কেঁপে কেঁপে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে। এই কান্না তো আসলে প্রতীকী কান্না। নিত্যচরণের জীবন থেকে উঠে আসা অসহায়তার কান্না।

উল্লেখপঞ্জি

১. Disable Person in India a statistical Profile 2016.

২. ঋকবেদ সংহিতা। রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ। হরফ প্রকাশনী।

৩. লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না। দৌলত কাজি। সম্পা- দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ।

৪. শিক্ষা। ছাত্রসম্ভাষণ। রবীন্দ্র রচনাবলী।

৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে’জ। পৃষ্ঠা ২১৪।

৬. মানিক উপন্যাস সমগ্র। পদ্মা নদীর মাঝি। কামিনী প্রকাশনী। পৃষ্ঠা ১০৯।

৭. ঐ পৃষ্ঠা ২৩৭

৮. সেরা পাঁচটি উপন্যাস। বিদূষক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । মিত্র ও ঘোষ। ১৪২২। পৃষ্ঠা ৬৯

৯. দশটি উপন্যাস। মতি নন্দী। আনন্দ পাবলিশার্স। পৃষ্ঠা ৫৫৭।

১০. আমি। রচনাবলী। বিমল মিত্র। মিত্র ও ঘোষ। ১৪১৮। পৃষ্ঠা ২৪৮।

১১. স্পর্শের বাইরে। আবুল বাশার। আনন্দ। ১৯৯৫।

১২. কাকাবাবু সমগ্র। প্রথম খণ্ড। ভূমিকা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আনন্দ। ২০১১।

১৩. ঐ। পৃষ্ঠা ১২।

১৪. কালবেলা। তৃতীয় খণ্ড। সমরেশ মজুমদার। দে'জ

১৫ . মানিক গল্প সমগ্র। প্রথম খণ্ড। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এস.বি. এস. পাবলিকেশন। পৃষ্ঠা ৭২৪

১৬. ঐ

১৭. শ্রেষ্ঠ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্পাদনা- সৈয়দ আজিজুল হক। ২০১৫। অবসর। পৃষ্ঠা ২৮।

১৮. জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প। সম্পা- ড. নিতাই বসু। দে'জ। ১৯৬০। পৃষ্ঠা ২৮৭

১৯। শ্রেষ্ঠ গল্প। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। দে'জ। ১৯৪৯। পৃষ্ঠা ১৭৭

উপসংহার

দীর্ঘ গবেষণার শেষে আমরা কয়েকটি সিধান্তে পৌঁছাতে পারি। তবে তার আগে এক ঝলকে দেখে নিতে হবে এই অন্যতর সক্ষম চরিত্রদের পুনর্বাসন প্রসঙ্গে। পুনর্বাসন বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মৌলিক অধিকারের আয়ত্বাধীন। ফলত সাহিত্য যেহেতু সমাজের দর্পণ একজন প্রতিস্পর্ধী চরিত্রের লড়াই বা হেরে যাওয়া যে ভাবে দেখায় সে ভাবে ত্যাদের পুনর্বাসন নাও দেখাতে পারে। আমার গবেষণার মধ্যে আলোচিত অন্যতর সক্ষম চরিত্রেরা সামাজিক লাঞ্ছনা বঞ্চনার শিকার হয়েছে। প্রান্তিক মানুষ হয়ে জীবন কাটিয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁদের বাঁচার জন্য কোন দিশা দেখানো হয় নি। আসলে একজন দৃষ্টিহীন বা একজন মানসিক প্রতিস্পর্ধী মানুষের সমস্যা ভুক্ত ভোগী মানুষটি ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাঁদের সমস্যার সমাধান দেখানোর দায়িত্বও একজন লেখকের থাকে না। শিল্প শিল্পের জন্য। তবে কিছু উপন্যাস বা ছোটগল্পে এই সব অন্যতর সক্ষমদের পরিণতি দেখানো হয়েছে। সেখান থেকে তাঁদের একটা পুনর্বাসনের আভাস তুলে ধরতে পারব।

উপন্যাস	রচয়িতা	রচনাকাল	বিশিষ্টতা	পরিণতি
রজনী	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৭	রজনী চরিত্রের অন্ধত্ব	সাধুর কৃপায় দৃষ্টি লাভ ও সুস্থ জীবন যাপন
শ্যামলী	নিরূপমা দেবী	১৯৩২	মূক ও বধির শ্যামলী	সুস্থ সংসার জীবন
শৃঙ্খল	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	১৯৩২	বিশ্বেশ্বরের পঙ্গুত্ব	বঞ্চনা
জননী	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩৫	শ্যামার মেয়ে জন্মান্ধ	মায়ের কাছে অন্য সন্তানদের মতো লালিত
পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৩৬	মালা	স্বামী পরিত্যক্ত
মহানগর	সুশীল জানা	১৯৫২	জয়ন্তীর বাবা পঙ্গু	বঞ্চনা
পঞ্চ পুত্তলী	তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৫	হাবা ফড়িং জড়বুদ্ধি	অপঘাতে মৃত্যু
বেলা ভূমির গান	সুশীল জানা	১৯৫৫	বোবা চন্দ্র ওস্তাদ	নিরুদ্দেশ যাত্রা
ঢোরাই চরিত মানস	সতীনাথ ভাদুড়ী	১৯৪৯	বোকা বাওয়া	নিরুদ্দেশ যাত্রা

ঠিকানা বদল	অমরেন্দ্র ঘোষ	১৯৫৭	অহল্যার পঙ্গু স্বামী	বঞ্চনা
সন্ধ্যা সকাল	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৫৭	পঙ্গু অবিনাশ	বঞ্চনা
বিদূষক	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৫৯	বিকৃত দেহের জোকার	আত্মহত্যা
প্রেমতারা	মহাশ্বেতা দেবী	১৯৫৯	পঙ্গু মনোহর	বঞ্চনা
এসো নীপবনে	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬১	বিকলাঙ্গ কবি অবনী	বঞ্চনা ও আত্মহত্যা
কর্ণাট রাগ	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৬২	পঙ্গু আব্বাসি	বঞ্চনা
সুখ অসুখ	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৯৬৮	পাগল বাবা	বঞ্চনা
জানমারি	মুজতবা সিরাজ	১৯৯০	প্রতিবন্ধী চুনি	বঞ্চনা
চাঁদের গায়ে চাঁদ	তিলোত্তমা মজুমদার	২০০৩	মানসিক প্রতিবন্ধী অলোক	অকর্ম ও উদ্দেশ্যহীন জীবন
কালো ঘোড়া	ইমদাদুল হক মিলন	২০১৭	বোবা কালী	ধর্ষিতা ও আত্মহত্যা
তৃতীয় নয়ন	অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত	১৯৩৩	অন্ধ মিহির	অন্ধত্বকে জয় করে নতুন জীবনের সন্ধান
পূর্ণ অপূর্ণ	বিমল কর	১৩৭৯	অন্ধ নির্মলা	অন্ধ আশ্রমে সেবিকার দায়িত্ব
ছোট বাবু	মতি নন্দী	১৯৯৬	পঙ্গু দ্বীপ	সম্পূর্ণ সহযোগী পিতা মাতা থাকা সত্বেও সামজিক বঞ্চনার শিকার
স্পর্শের বাইরে	আবুল বাশার	১৯৯৫	পঙ্গু ঈশানচন্দ্র	জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও পারিবারিক বঞ্চনার শিকার
উত্তর সারথি	সেলিনা হোসেন	১৯৭১	বোবা নারী	ধর্ষিতা
ওঙ্কার	আহমেদ ছফা	১৯৭৫	বোবা নারী	বিয়ে দিতে সমস্যা হলেও বিয়ের পর স্বাভাবিক জীবন
লালু ও ভুলু	নীহাররঞ্জন রায়		অন্ধ ও খোঁড়া	সুস্থ জীবনের সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও না পাওয়া
অন্ধ জন্মান্ধদের কথা	সমীর রক্ষিত	২০১৬	অন্ধ	অন্ধ হওয়ার পর ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ

অথৰ্বতহাএকটি প্রেমের উপাখ্যান				
আমি	বিমল মিত্র	১৯৭২	খোঁড়া নুটু	বিকল্প জীবিকা সত্বেও নিরুদ্দেশ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ গল্পে ও উপন্যাসে প্রতিটি অন্যতর সক্ষম চরিত্রদের মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকা সত্বেও এই চরিত্রদের সহায়ক হয়নি। অধিকাংশ চরিত্রের ক্ষেত্রে সামাজিক, পারিবারিক বঞ্চনার ইতিহাস আমরা দেখতে পেয়েছি। সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সুতরাং এই তথ্যের মধ্যে আমাদের অশনি সঙ্কেত দেখতে পাবো।

গ্রন্থপঞ্জি

১. হুমায়ুন আহমেদ । উপন্যাস সমগ্র। প্রতীক প্রকাশন। ঢাকা। বাংলাদেশ।

২. সুমিতা চক্রবর্তী। উপন্যাসের বর্ণমালা। পুস্তক বিপণি । কল-৯। ১৯৯৮।

৩. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। কালের প্রতিমা। দে’জ। কোল-৭৩। ১৯৭৪

৪. ফাল্গুনী ভট্টাচার্য। সাহিত্য ও সিনেমায় প্রতিবন্ধী। । পরম্পরা। কল-৯। ২০১১।

৫. রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত। গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় । পুস্তক বিপণি। ১৯৮১

৬. অশ্রুকুমার সিকদার, *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস,* অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, মার্চ ২০০৩।

৭. বিনয় ঘোষ, (১৯৯৯), *মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা।

৮. সালাউদ্দীন আইয়ুব, (২০১৪), *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

৯. অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য [সম্পাদিত] (১৪২২), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প,* কলকাতা, প্রকাশ ভবন।

১০. রণেশ দাশগুপ্ত (১৩৬৬), *উপন্যাসের শিল্পরূপ,* ঢাকা, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স।

১১. উজ্জ্বল মজুমদার সম্পা। তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য। মডার্ন বুক এজেন্সি। কল-৭৩

১২. ভূদেব চৌধুরী। বাঙলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার। মডার্ন বুক এজেন্সি। কল-৭৩

১৩. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়। বিশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস। দে'জ পাবলিশিং। কোল-৭৩

১৪. সরোজ মোহন মিত্র। বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প। তুলসী। ১৯৯৭।

১৫. ভাস্বতী চক্রবর্তী। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্প। দে'জ। ২০05

১৬. অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ। মানসিক প্রতিবন্ধিতা : জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানগত দিক। দীপ প্রকাশন। কোলকাতা।

১৭. অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ।আধুনিক গবেষণার আলোকে ডাউন্স সিন্ড্রোম। দীপ প্রকাশন। কোলকাতা।

১৮. অধ্যাপক বিষ্ণুপদ নন্দ ও অধ্যাপক সারাওয়াতারা জামান। ব্যতিক্রমধর্মী শিশু। ২০১৪। মাওলা ব্রাদার্স। ঢাকা।

১৯. রমেশচন্দ্র দত্ত। বেদ। ১-৫ খণ্ড। হরফ প্রকাশনী।

২০. রাজশেখর বসু। বাল্মীকি রামায়ণ। নবযুগ প্রকাশনী। ২০০৮

২১. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমাদের মহাভারত। আনন্দ পাবলিশার্স।

২২. কালীপ্রসন্ন সিংহ। মহাভারত। তুলি কলম।

২৩. সম্পা- সমীর চৌধুরী। হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন। কথা ও কাহিনি। কোল- ৭৩। ১৯৯৮।

২৪. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (এক থেকে এগারো খণ্ড)- মর্ডান বুক এজেন্সি। কোলকাতা।

২৫. শেখ আমজাদ হোসেন। ব্যতিক্রমী শিশু ও বিশেষ শিক্ষা। প্রভাতি লাইব্রেরি। ঢাকা।

২৬. সোমনাথ মুন্সি। দশে মিলি করি পাঠ। বিকাশায়ন। কোলকাতা।

২৭. সব্যসাচী পড়ুয়া (সম্পা) । আমার সন্তান স্পেশাল চাইল্ড। অভিযান। কোল।

২৮. অলোক রায়। কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা। সাহিত্যলোক। ১৯৯২।

২৯. সম্পা-সুবল সামন্ত। বাংলা উপন্যাসে : বীক্ষা ও অনীক্ষা। পুস্তক বিপণি। ১৯৯৮।

৩০. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে (বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস) । দে'জ। ১৯৯৪

৩১. পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্তর্বয়ন : কথাসাহিত্য। কোল। ১৯৯০

৩২. তপোধীর ভট্টাচার্য। উপন্যাসের বিনির্মাণ । বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ। কোল। ২০১০

৩৩.নবেন্দু সেন (সম্পা)। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা। রত্নাবলী

৩৪. সঞ্জীব দাস। বাস্তববাদের বহুরূপ ও শৈলজানন্দের কথা সাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩৫. সমরেশ মজুমদার সম্পা। জগদীশ গুপ্ত : জীবন ও সাহিত্য। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

৩৬. মিঠু নাগ। গৌরকিশোর ঘোষ: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

সমগ্র / রচনাবলী

১.*মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৮-২০০১।

২. বিমল মিত্র। রচনাবলী। (এক থেকে ষষ্ঠ খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ। কোলকাতা

৩. রবীন্দ্র রচনাবলী। (এক থেকে ত্রিশ খণ্ড)। ঐতিহ্য। ঢাকা। বাংলাদেশ।

৪. বনফুল । (১-২৪ খণ্ড) । গ্রন্থালয়। কোলকাতা- ৭৩

৫. অচিন্ত্যকুমার রচনাবলী। (১-১০ খণ্ড) গ্রন্থালয়। কোলকাতা- ৭৩

৬. গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী। (১-১০ খণ্ড) মিত্র ও ঘোষ। কোল

৭. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী। (১-১২ খণ্ড) । মিত্র ও ঘোষ। কোল

৮. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী। (১-১১ খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কোল

৯. *জীবনানন্দ সমগ্র* (২০০১- ১৯৯০), দেবেশ রায় (সম্পাদক), প্রতীক্ষণ, কলকাতা।

১০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কাকাবাবু সমগ্র। (এক থেকে ষষ্ঠ খণ্ড)- আনন্দ পাবলিশার্স। কোলকাতা।

১১. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । গল্প সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ।

শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকলন

১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ।

২. শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ

৩. অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা। দে'জ।

৪. শামসুর রহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা। সাহিত্য প্রকাশ। ১৯৯৩

৫. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবিতা । দে'জ

৬.জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা। নিউ স্ক্রিপ্ট।

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

১. গল্প সরণি পত্রিকা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা। সম্পাদনা- অমর দে। ২০১৬

২. সুন্দরবন কথা সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা। সমকালের জিয়নকাঠি। প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল। ২০১১

৩. সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা। সমকালের জিয়নকাঠি। প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল। ২০১০

৪. সুন্দরবন কথা সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা।সমকালের জিয়নকাঠি। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল। ২০১৩

৫. সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা।সমকালের জিয়নকাঠি। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল। ডিসেম্বর, ২০০৮

৬. শচীন দাস স্মরণ সংখ্যা ।সমকালের জিয়নকাঠি। প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা : নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল। ২০১৬

৭. সাহিত্য অঙ্গন সোহারাব হোসেন সংখ্যা।

৮. পথ। স্বপ্নময় চক্রবর্তী সংখ্যা।

সাক্ষাৎকার ১

(**সঞ্জীব রজক**। জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন অন্যতর সক্ষম। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমানে সুশীল কর কলেজের অধ্যাপক। এম.ফিল. গবেষণা করেছেন বাংলা ছোটগল্পে অন্ধত্ব নিয়ে। বর্তমানে পিএইচ.ডি. করছেন বাংলা কথা সাহিত্যে দৃষ্টিহীনদের নিয়ে। তিনি একধারে কবি ও গায়ক। প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ।)

গবেষক : **বাংলা সাহিত্যে আগ্রহ জন্মাল কীভাবে ?**

সঞ্জীব রজক: বাংলা সাহিত্যে প্রতিস্পর্ধী চরিত্র নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে ছিল । এ বিষয়ে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। গবেষণা করলেই যে বাস্তবে প্রতিস্পর্ধীদের উপর খুব প্রভাব পরবে তা নয়। এটি একটি প্রাথমিক স্তরের কাজ। তাদের ব্যক্তিগত সমস্যা সামাজিক সমস্যা সত্বেও তাকে লড়াই করে বড়ো হতে হয়। চাকরি ক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে না , বা চাকরি করলেও সহ কর্মীদের সহযোগিতা পাচ্ছেন না, যে গুলো আগে মেয়েদের ক্ষেত্রে ছিল। মেয়েদেরও লড়াই করে জায়গা করে নিতে হয়েছে। যদিও এখন সমাজ বদলেছে। তেমন বাধা আগের মতো নেই। ছবিটা এখন পাল্টেছে। এগুলো ছেলেবেলায় শুনেছি। এটা নয় যে কাজ হয়নি। বই তেমন পাওয়া যায় না। ফাল্গুনীবাবুর বইটা সাহিত্যের ওপর কাজ হয়েছে। বিষ্ণুপদবাবুর বই বিষয় নির্ভর। সাহিত্যের উপর তাঁর কিছু লেখা নেই।

গবেষক : **'প্রতিবন্ধী' শব্দটিকে পরিবর্তিত করে প্রথমে করা হল অন্যতর সক্ষম, তারপর বিষ্ণুপদবাবু সেই :শব্দটিকে এখন নতুন করে 'প্রতিস্পর্ধী' বলতে চান। এই যে যাত্রাপথ এবিষয়ে তোমার মতামত কী ?**

সঞ্জীব রজক :

পরিভাষার দিক থেকে এটি ভালো শব্দ। আসলে 'কী' বলা হল তার চেয়ে ভাবতে হবে 'কী' করা হল তাই নিয়ে। যেমন অন্ধ না বলে আমি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বললাম কিন্তু বাস্তবে আমরা তার সঙ্গে সেই উপযুক্ত আচরণ বা ব্যবহার করছি না। যদি তার দক্ষতার উপর আমার কোনও বিশ্বাস না থাকে সেক্ষেত্রে কী বলা হল সেটা কোনো কাজে আসবে না। যদিও বলাটা একটা প্রাথমিক ব্যাপার। পরিভাষার দিক থেকে খুব ভালো শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে বদল দরকার মানুষের মানসিকতার। তা না হলে এসব বলে কিছু লাভ নেই।

গবেষক: **আপনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্র। এখন কলেজে আছেন। গবেষণা করেছেন দৃষ্টিহীন চরিত্রদের নিয়ে, এবিষয়ে একটু বলুন।**

সঞ্জীব রজক : আমি যে গবেষণাটা করেছিলাম, 'বাংলা ছোটোগল্পে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের চর্চা ও অবস্থান : সমাজমনস্কতার পাঠ' । বারোটি ছোটোগল্প নিয়েছিলাম **১০০** বছরের মধ্যে হাজার **১৮৯১** থেকে **১৯৯১** পর্যন্ত সময়টাকে নিয়ে। সামাজিক ক্ষেত্রে কতো সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, কাজের ক্ষেত্রে সদর্থক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে , সাহিত্যে প্রতিফলন ঘটেনি। প্রতিবন্ধী ? এরা আর কী করবে! পড়বে, গান করবে এর বেশি আর কী পারে? তবে সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেল' নামে একটি গল্প পেয়েছি যেখানে অন্তত অনেকটা প্রতিবাদ করা গেছে। এই গল্পে একজন কোম্পানির মালিক, একজন চাকরি করে। দুজন বন্ধুর একজন প্রতিবন্ধী। ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের গল্প 'গোলকধাঁধা রহস্য'এ একজন বিজ্ঞানী ছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে তার চোখ নষ্ট করে দেয়। সে অন্ধত্বের শিকার হয়। এটা মনে রেখে পরবর্তীকালে প্রতিহিংসা স্বরূপ তাকে খুন করে। এটা ভেবে ভালো লাগে সে খুন করতে পারে। তবে নেগেটিভ অর্থে। **১২**টি গল্পের মধ্যে মাত্র দুটি গল্পের চরিত্রকে অসহায় ভাবে দেখানো হয় নি, বাকি গল্পে গতানুগতিক চরিত্র আছে।

গবেষক: **যে 12 টি গল্প নিয়ে তুমি কাজ করেছো তার মধ্যে কোন চরিত্র তোমার কাছে বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়েছে ?**

সঞ্জীব রজক : সুবোধ ঘোষের 'চোখ গেল'। তারাশঙ্করেরও গল্প আছে কিন্তু কোনটাই ঠিক সামাজিক মানুষ হয়ে উঠতে পারছে না এই চরিত্রগুলি।

গবেষক: একজন গবেষকও প্রতিস্পর্ধী হিসাবে আপনার কি মনে হয় একজন সাহিত্যিক যে প্রতিবন্ধী চরিত্র আঁকেন তা বাস্তব চরিত্র হয়ে উঠতে পারছে?

সঞ্জীব রজক : হ্যাঁ একজন সাহিত্যিকের আলাদা দৃষ্টি, আলাদা ক্ষমতা আছে বলেই তিনি সাহিত্যিক সাধারণে যা দেখতে পায় না তা দেখতে পান। তা সত্ত্বেও ফারাক থাকে। অভিজ্ঞতার নিরিখে অভিজ্ঞতার জগতে খামতি থাকে বলেই কোনো কোনো গল্পে বাস্তবের এই অসঙ্গতি থাকতে পারে। যেমন 'রজনী' । বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস। শেষটা ঠিক নয় তাঁর সন্ন্যাসী এর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া সেটা ঠিক ভালো লাগে না। কিন্তু রজনীর জগত তার যে বিশ্লেষণ, সেটা অসাধারণ। বঙ্কিমচন্দ্র পারলেন কিভাবে? তার মানে তিনি বেশি দেখেছেন, তা নয়।। এখানেই তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে বলে সাহিত্যিক প্রজ্ঞা। রজনী বলছে স্পর্শ যেন বীণার ধ্বনির মতো। শচীন্দ্রের স্পর্শ ফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কারণ সে তো ফুল নিয়ে কাজ করে। রজনীর অভিজ্ঞতার জগত তার মনোজগতের যে বিশ্লেষণ, তা অসাধারণ।

গবেষক : **বাস্তবের রজনীরা সত্যিই কি এমন রোমান্টিক হয়?**

সঞ্জীব রজক : হ্যাঁ তা না হওয়ার কোনো কারন নেই। এখানে আমার একটা বক্তব্য যা অনেকের মতের সঙ্গে মেলে না, সেটা হচ্ছে একজন মানুষ যেমন হয় তেমনি হবে। তবে তার সামাজিক ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়। প্রথম হয় জ্ঞান গ্রহণের ওপর। যার সব ইন্দ্রিয় ঠিক আছে তার জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যম ইন্দ্রিয়। দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন শিশুদের মাথা একই। ফলে জ্ঞান গ্রহণের পর যেখানে তা সংরক্ষিত হচ্ছে দুজনের সেটি একই। দুজনের পার্থক্য চিরস্থায়ী হয় না, অভিজ্ঞতার পার্থক্য থাকে। যেমন একজন দৃষ্টিহীন শিশু ও একজন দৃষ্টিমান শিশু দুজনে পাহাড়ে গেল। সেখানে একজন দেখতে পেল, একজন পেল না। সেই সময়ের জন্য। কিন্তু যদি দৃষ্টিহীন শিশুর পাহাড়ের সৌন্দর্যসম্পর্কে পড়া থাকে তাহলে তার অভিজ্ঞতা সমান্তরাল হয়ে যাবে। তারাশঙ্কর জনপ্রিয় কেন তার দেখার জগৎ অভিজ্ঞতার জগত নিয়ে তিনি লিখেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে থাকে সেটা।

গবেষক: **খুব জানতে ইচ্ছা করে এই যে যারা চক্ষুষ্মান তারা যখন কোনো সাহিত্য পাঠ করছে রিসিভার বা চোখ দ্বারা অক্ষরগুলো দেখছে, দৃশ্যগুলো জেনে যাচ্ছে। এক ধরনের আনন্দ পাচ্ছে সে। তুমি যেটা করছ হাত দিয়ে স্পর্শ করে অক্ষরগুলো বুঝছো ও মাথায় গ্রহণ করছ এই আস্বাদন প্রক্রিয়া তোমার কাছে কেমন লাগে ?**

সঞ্জীব রজক: আমি আনন্দ পাচ্ছি বা পাচ্ছি না বা জিনিস পড়ে রেগে যাচ্ছি বা উত্তেজিত হচ্ছি এই পুরো প্রক্রিয়াটা কিন্তু চোখ হাত-পা কানের মাধ্যমে হচ্ছে. কিন্তু চোখ হাত-পা এগুলো নার্ভের মাধ্যমে পুরোটা নিয়ন্ত্রণ করছে ব্রেন। ব্রেন যে ধরনের সংবেদন দিচ্ছে। যদি একটা ভিলেন চরিত্র পড়ছি, রাগ হচ্ছে। হতে পারে ভালো চরিত্র পড়ে আমার আনন্দ হচ্ছে, হতে পারে। কারণ এগুলো ব্রেন সংবেদনগুলো কোন কোন নার্ভে পাঠাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে।

গবেষক : **তোমার স্পেশাল পেপার কি ছিল ?**

সঞ্জীব রজক: মধ্যযুগ।

গবেষক : **ক্লাসে কী কী পড়াতে হয় ?**

সঞ্জীব রজক : ক্লাসে কবিতা পড়াই, উপন্যাস পড়াই। আধুনিক যুগ বেশি পড়াই। কারণ, মানুষ হাজার হাজার বছর আগে শুনে শুনে পড়াশোনা করে এসেছে। শ্রুতিই আদি পাঠ।

গবেষক : **পিএইচডি কি নিয়ে করবে ?**

সঞ্জীব রজক : কথাসাহিত্য নিয়ে। সমাজ মনস্কতা খুঁজবো। সামাজিক মানুষ হিসাবে একজন লেখক কতটা এই ধরণের চরিত্রকে চিত্রিত করেছেন বা করেননি, যদি না হয় কি কারনে তা হয়নি সেই সব বিষয় খুজবো।

গবেষক: **কি কি অধ্যায় বিভাগ করবে ?**

সঞ্জীব রজক : চরিত্র গুলোর মধ্যে কি কি পাচ্ছি , ছোটগল্প উপন্যাসে কীভাবে চরিত্রগুলো আছে, পরিভাষা কেন্দ্রিক আলোচনা , প্রতিবন্ধী প্রতিস্পর্ধী-- আমি আগে যেগুলো বলেছি সেগুলো কোথায় কোথায় মিলছে না দেখতে হবে, ফাল্গুনীবাবুর বইয়ে সেগুলি নেই। দুশো বছর দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা নিয়ে কি কি ভাবা হয়েছে এই ভাবেই করব।

গবেষক : **আমাদের যে আইনব্যবস্থা আছে সেখানে প্রতিস্পর্ধী চরিত্রদের জন্য যে যে বিধান আছে সে বিষয়ে কতটুকু সুযোগ-সুবিধা এখনকার প্রতিস্পর্ধীরা ?**

সঞ্জীব রজক :সুযোগ সুবিধা আছে। ২০১৩-তে অনেক বেশি অসুবিধা ছিল। এখনকার সংশোধিত আইনে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে একজন কেউ সুযোগ পেল কি না পেল তার চেয়ে কার কারনে পেল না সে ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপের ব্যবস্থা না করলে কিছুই হবে না। অমুক জায়গায় চিঠি লেখ, তমুককে লেখ, এগুলো দীর্ঘদিন হয়ে পড়ে। ব্যাংকে আমাকে এমন সমস্যায় পড়তে হয়েছে। আসলে কিছু মানুষ আছে যারা এটা করে। শুধু ধর্মের নয়, বিজ্ঞানের গোঁড়ামি হয় , শিক্ষা গোঁড়ামি হয্ রাজনীতির গোঁড়ামিও হয়। অর্থাৎ আমি যেটা জানি এর বাইরে আর কিছু হয়না। যেহেতু সংবিধানে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো কড়া পদক্ষেপের কথা বলা নেই, ফলে সেটা বলবৎ করা সমস্যা। শুধু সুযোগ-সুবিধা দিলে হবে না, তা কিভাবে কার্যকরী করা যাবে সেটা দেখতে হবে ।

গবেষক : **অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।**

সঞ্জীব রজক : আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার ২

দিলীপ মণ্ডল (দিলীপ মণ্ডল। পেশায় পুতুল নাটক শিল্পী। তাঁর দলের নাম ধূমকেতু। ভেন্ট্রিকুলিসিমও জানেন তিনি। বই লিখেছেন 'কথা বলা পুতুল' নামে। শুধু তাই নয়, তিনি বিশেষ মানুষ বা মানসিক প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে ওয়ার্কশপ করেন। অটিস্টিক কিশোর যুবকদের পুতুল নাচ শেখান, অভিনয় করান। সমাজ যাদের জড়বুদ্ধি বলে, তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া এই বিষয়টি মনে হয়েছে প্রতিস্পর্ধীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জরুরি। তাই একদিন তাঁর বাড়িতে হাজির হলাম।)

গবেষক : **আপনি প্রথমে যখন পাপেট করতে এলেন সেই ইতিহাস টা সম্পর্কে বলুন**

দিলীপ মণ্ডল : একটা স্কুলের অনুষ্ঠানে কথা-বলা-পুতুল-এর অনুষ্ঠান দেখছিলাম। পাশে একটা সুটকেস ছিল। মনে হচ্ছিল সেখানে নিশ্চয়ই টেপ রেকর্ডার আছে। আমার কৌতূহল থেকেই কথা-বলা-পুতুল-এর রহস্য উদঘাটন করতে চাইলাম। তারপর মনে হলো পুতুলটা যদি আমার জগৎ হয়, কেমন হয়? আমার গুরু সোমনাথ মজুমদার এ ব্যাপারে আমায় সহযোগিতা করেন। এখন সারা দেশেই যাচ্ছি, কাজ করছি , কোন ইনস্টিটিউট নেই আমার। মাঝে বাংলাদেশও গেছি।

গবেষক : **আপনি তাহলে এই বিশ্বাস রাখেন যে পাপেট থিয়েটার-এর মধ্য দিয়ে প্রতিস্পর্ধী চরিত্রদের এক ধরনের চিকিৎসা করা যেতে পারে?**

দিলীপ মণ্ডল : হ্যাঁ যদি লেগে থাকতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই হতে পারে। সেই বিশ্বাস নিয়ে দেড় বছর ধরে ওদের নিয়ে কাজ করছি। অভিবাবকরাও আসছে। তাদের উন্নতি হচ্ছে। এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

গবেষক : **আপনার কাছে আসার আগে তাদের যা অবস্থা ছিল, দেড় বছর পর কেমন পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?**

দিলীপ মণ্ডল : জরতা অনেক কেটেছে। শারীরিকভাবে বা কথা বলার আরষ্টতা সরে যাচ্ছে। অন্যের সামনে কিছু করতে গেলে অনেকে বেশি অভিনয় করে, আবার অনেকে বলতে সাহস পায় না, তাদের কে এখন পরিবর্তিত হতে দেখেছি।

গবেষক : **যে সমস্ত বাচ্চাদের আমাদের সমাজ মনে করে আবর্জনা, তাদেরকে নিয়ে কাজ করার কথা ভাবলেন কি করে?**

দিলীপ মণ্ডল : যে অটিস্টিক ছেলে-মেয়েদের যাদের 'এ্যাবনরমাল' বা অস্বাভাবিক বলে থাকি, তাদের দিয়ে অভ্যাস করালে ওরা অনেক কাজ করতে পারে, ওরা কাজ করতে গিয়ে আনন্দ পাচ্ছ্ সেটা বুঝতে পারি। অনেকে নড়তে চায়না, বসেই থাকে। কিন্তু পাপেটের মধ্যে দিয়ে দেখি ওরা সাড়া দিচ্ছে। আমার দস্তানা পাপেট হাতে নিয়ে নাড়ছে চাড়ছে, হাততালি দিচ্ছে।

যেখানে এদের পড়ানো হয় সেখানে গিয়ে তাদের পাপেট শো দেখাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ওদের শিক্ষকরাও এ ব্যাপারে আনন্দিত হয়। কথা বলে না এমন বাচ্ছাদের কয়েকজন অভিভাবক নিলে একটি সেক্টর করেছিল। আমি ঠিক করেছিলাম সেখানে আমরা শো দেখাবো না। ওদের দিয়ে কতটা কি করানো যায় দেখব। তারপর প্রত্যেককে পাপেট ধরিয়ে দিলাম এবং আমি আরেকটি পুতুলের সঙ্গে কথা বললাম। ফলে একটি মেয়ে, একদমই কথা বলতো না, সেও দেখি বলছে, 'এই তোর নাম কিরে' ? তোর নাম কি বলছে। 'আমার নাম খুশি'। সে নিজেই পুতুলটির নাম দিয়ে দিল। এমন ছোট ছোট দৃশ্য দেখে আমার মনে হল আমার এই কাজের মাধ্যমে সমাজে যদি কারো উপকার হয় তো হোক না। আমি এভাবেই লেগে পড়লাম। আমরা সপ্তাহে একবার

অভিভাবকসহ এই অটিস্টিক ছেলের মেয়েদের দিয়ে একটি একটি নাটক করাই। তাদের নিয়ে রিহার্সাল দিই। এসব করে ওরা এবং তাদের বাবা-মায়েরা ভীষণ আনন্দ পায় এতে।

গবেষক : **কতজন বাচ্ছা ছেলে-মেয়ে আছে আপনার এই দলে ?**

দিলীপ মণ্ডল : আসলে এরা কেউ বাচ্চা নয়। সবাই বড় হয়ে গেছে। কেউ কেউ আবার স্কুলেও যায় না। বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন ডানলপ, সিঙ্গুর থেকে আসে। অভিভাবকরা এদের কাজে লাগাতে পেরে আনন্দ পাচ্ছে।

গবেষক : **যারা আপনার কাছে আসে তাদের সমস্যা গুলি কেমন দেখেন?**

দিলীপ মণ্ডল : অনেকে বুদ্ধিমান, অনেকে ভালো গান করে, অনেকে আছে অন্যরকমের। একজন ছিল পুতুল দেখে ভয় পায়। সেই ভয় কাটানোর জন্য আমি তাকে উৎসাহ দিই। পুতুল হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটু নাচে। আনন্দ পায়। ভয় কাটায়। অনেকে খুব লাজুক, কথা বলতেই চায় না। সবচেয়ে বড় কথা এরা খুব ভুলে যায়। অনেকে আবার সতর্ক । কেউ কেউ কখন কি বলতে হবে জানে না। অনেকে ভাবে আমি বোধহয় পারবো না, ভুলে যাবো। এমন ভাবে, হয়তো বললাম ডান দিকে ঘোরো, অন্য দিকে ঘুরে গেল। ওদের মুখোশ দিয়ে বলিয়েছি, নিজেরা সম্পূর্ণ মুখে বলে বলে করেছে। এটা আমাদের কাছে বড় পাওনা। না পেয়ে করল। আমরা কোনো সাহায্য করি নি। ওরা অভিনয় করে ওয়ার্কসপে। কীভাবে ঢুকবে, কীভাবে বেরোবে। সংলাপের সঙ্গে বডি মুভমেন্ট, এভাবেই আমরা রিহের্সাল দিই। ওরা তা শো-তে গিয়ে করে দিতে পারে।

গবেষক : **গল্পগুলো যখন লিখছেন তখন কি সচেতনভাবে এদের জন্য আলাদা করে গল্প লেখার কথা ভাবছেন ?**

দিলীপ মণ্ডল : বাচ্চাদের জন্য যেমন ভাবা হয় যেমন দুষ্টু চোরের গল্প, ব্রাহ্মণ কে ঠকিয়ে ছাগল নিয়ে নেওয়ার গল্প ,মানুষকে ঠকানোর ব্যাপারটা শো-তে দেখানো হয়। এখনো পর্যন্ত আলাদা করে কিছু ভাবা হয়নি।

গবেষক : **আপনি যাদের নিয়ে কাজ করছেন তারা অভিনয় করে কেমন আনন্দ পায় ?**

দিলীপ মণ্ডল : এরা সব সময় ভাব প্রকাশ করতে পারে না। ওই মুহূর্তে হয়তো আনন্দ পেল, পরে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারে না। বারবার প্রশ্ন করে ঠিক হয়েছে তো ? পেরেছি তো? অর্থাৎ বোঝা যায় না ঠিক এদের আনন্দের রেশ কতটা থাকে? তবে আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমরা নিজের থেকে আসো, না বাবা-মা জোর করে আনে ? প্রত্যেকেই বলেছে আনন্দের সঙ্গে নিজের থেকে আসে।

গবেষক : **যারা দর্শক তাদের প্রতিক্রিয়া কেমন দেখতে পান?**

দিলীপ মণ্ডল : এরা যে, কাজটা করতে পারছে এদেরকে নিয়ে যে কাজ করানো যায় এটা ভাবেন দর্শক। আনন্দ পায় দর্শকরাও, সমান ভাবেই আনন্দ পায়।

গবেষক : **অটিস্টিক ছাড়াও আরো প্রতিস্পর্ধী চরিত্র আছে , তাদের নিয়ে কি কাজ করেন?**

দিলীপ মণ্ডল : দৃষ্টি প্রতিস্পর্ধী কেউ নেই। তবে কয়েকজন আছে যারা কথা বলতে পারে না । তারা চেষ্টা করছে আনন্দ পাচ্ছে, কাজ করছে।

গবেষক : **অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।**

দিলীপ মণ্ডল : আপনাকেও ধন্যবাদ।

সাক্ষাৎকার ৩

(**ডক্টর বিষ্ণুপদ নন্দ**। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক। প্রতিস্পর্ধী চরিত্রদের বিষয়ে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা। বহু গ্রন্থ প্রণেতা। প্রতিবন্ধী থেকে প্রতিস্প্রর্ধী নামকরণে তাঁর আন্দোলন। সম্পাদনা করেন **প্রতিস্পর্ধী** নামের একটি পত্রিকা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল— 'ব্যতিক্রমধর্মী শিশু', 'মানসিক প্রতিবন্ধিতা : জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানগত দিক', আধুনিক গবেষণার আলোকে ডাউন্স সিন্ড্রোম'।)

গবেষক : **প্রতিবন্ধী, অন্যতর সক্ষম, প্রতিস্পর্ধী-- বিশেষণগুলো বিকশিত হওয়ার যে সামাজিক আবেদন ও লড়াই তার ইতিহাসটা যদি একটু বলেন।**

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ: প্রতিবন্ধী শব্দটি নেগেটিভ শব্দ। একটা স্টিগমা। মনে হয় এরা পাপের ফসল, মনে হয় এরা কিছুই পারে না। ১৯৯৪ সালে যখন সালমানকা কনফারেন্স হল স্পেনের সালমানাকা নগরীতে তখন বিশ্বের সমস্ত দেশ একজোট হল এই সিদ্ধান্তে যে আমরা হ্যান্ডিক্যাপ শব্দ আর ব্যাবহার করব না। তখন আমরা বিকল্প শব্দের খোঁজ করতে লাগলাম। তখন বিকল্প শব্দের খোঁজ করতে গিয়ে ২০০২ তে আমি লিখলাম ব্যাতিক্রম ধর্মী শিশু। যে নামটা এখনো বহুলভাবে প্রচলিত। তখন থেকে অন্যতর সক্ষম শব্দটিও ব্যবহৃত হলো। আমি করলাম 'ব্যতিক্রম ধর্মী শিশু'। পরবর্তীকালে মনে হল শব্দটির বিস্তার অনেক কিছু বলে। সবাই তো প্রায় ব্যাতিক্রম ধর্মী। পরবর্তীতে মনে হলো যে ঠিক হয়নি। কারণ ব্যতিক্রম তো অনেক ভাবে হতে পারে। কেউ খেলা করে দুর্দান্ত ভালো, কেউ ভালো গান করে, কেউ নাচে,কেউ পড়াশোনায় ভালো,এরা তো সকলেই ব্যতিক্রম। 'প্রতিস্পর্ধী' শব্দ টা আমার একার তৈরি শব্দ নয়। নেতাজী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা আলোচনার মাধ্যমে এই

শব্দটি তৈরি করেছিলেন। প্রফেসর মনোতোষ দাস একটা সিদ্ধান্তে আসেন যে শব্দটা ডিকশনারিতে রয়েছে। বাংলা থেকে বাংলা অভিধানগুলোয় এই শব্দটি রয়েছে। কিন্তু এই শব্দটিকে সেই অর্থে কখনো প্রয়োগ করা হয়নি। আমি সেই শব্দটি পাওয়ার পর তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলতে সচেষ্ট হই। তাই 'প্রতিস্পর্ধী' এই নামে একটি দ্বি-মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই। গত ৫ বছর ধরে সেই পত্রিকাটি প্রকাশ করছি এবং খুব ধারাবাহিকভাবে কাজটি করা হচ্ছে। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার নতুন যে বই এর কাজ হচ্ছে সেখানে প্রতিস্পর্ধী শব্দটি ব্যবহার করেছি। এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন গবেষণাপত্র এবং লেখায় এই প্রতিস্পর্ধী শব্দটি ব্যবহার করেছি। এছাড়া একই ভাবে একটি এছাড়াশিক্ষায় একই ভবনে একটি বই একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। সেই বইটিতে আমি প্রতিস্পর্ধী শব্দটি ব্যবহার করেছি। স্বাভাবিকভাবে প্রতিস্পর্ধী শব্দটির গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকাতেও আমি বিষয়টি নিয়ে লিখেছি। এখনও পর্যন্ত সুখের বিষয় এই শব্দটির বিরুদ্ধাচারণ করে কেউ এখনো আমার কাছে বা আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তরে চিঠি লেখেননি। আমরা যেই শব্দ ব্যবহার করি না কেন অন্যতর সক্ষম বা অন্যভাবে সক্ষম বা প্রতিস্পর্ধী তার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে তিনি এমন কিছু করছেন যেটা স্বাভাবিকভাবে করা সম্ভব নয়। যেমন হেলেন কেলার। তিনি দৃষ্টিহীন হয়েছিলেন, তিনি মূক ও বধির হয়ে গেছিলেন। অথচ তিনি একের পর এক বই লিখেছেন, তিনি কি সাধারণভাবে সমর্থ? এটা কি তাঁর স্পর্ধা নয়? কিংবা মাসুদুর রহমান একের পর এক সমুদ্র, একের পর এক চ্যানেল সাঁতার দিয়ে গেছেন, অথচ হাঁটুর নিচ থেকে তার দুটো পা নেই এটা কি স্পর্ধা প্রদর্শন করা নয়? কিংবা বিটোফেন চোখে দেখতে না পেয়েও যিনি সুরের ঝড় তুলতে পারেন তাহলে কি সেটা স্পর্ধা প্রদর্শন করা নয়? এদের স্পর্ধা এটা গ্রহণযোগ্য স্পর্ধা। তাই আমি এই প্রতিশব্দটি ভীষণভাবে অন্তর থেকে গ্রহণ করেছি এবং আমার যেটুকু সীমা সেই সীমার মধ্যে শব্দটিকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছি। কারণ প্রতিবন্ধী শব্দের বিকল্প হিসেবে এই মুহূর্তে আর নতুন কোনো শব্দ নেই।

গবেষক : স্যার আপনি প্রতিস্পর্ধী নামের একটি পত্রিকাটি করেন। আমরা জানি লিটিল ম্যাগাজিনের একটি সামাজিক ভূমিকা আছে। ছোটপত্রিকাগুলি তৃণমূলস্তর থেকে লড়াই করে। প্রতিস্পর্ধী পত্রিকার এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা কি?

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ : প্রতিস্পর্ধী আমরা শুরু করেছিলাম আরোগ্য সন্ধান চ্যারিটেবল ট্রাস্টের যে দুটি সংস্থা রয়েছে তাদের একটির মুখপাত্র হিসেবে। সেখানকার সম্পাদক আমাকে এই পত্রিকার দায়িত্ব

দিয়েছিলেন। এই পত্রিকাটি দার্জিলিং থেকে শুরু করে পুরুলিয়া বাঁকুড়া পর্যন্ত প্রতি স্পর্ধী শিশুদের বাবা মা বা স্পেশাল এডুকেটেরদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে । আমি ভেবেছিলাম বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক বা শিক্ষকদের কাছে বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আমি প্রতিস্পর্ধীদের নিয়ে কাজ করছে যারা তাদের কাছে লেখা চেয়েছি এবং সেখান থেকে প্রতিবারে আমি একটি দুটি তিনটি বিষয় নিয়ে একটি সংখ্যা করেছি। আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের দপ্তরে আসা চিঠিগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার বিষয় সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে গবেষণাগুলির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছি। চতুর্থ এবং পঞ্চম বছর থেকে আমরা সাহিত্যধর্মী লেখা রাখতে শুরু করেছি। কারণ ডিসেবেল সেক্টরে লেখার মতো লোক এই মুহূর্তে নেই। বিভিন্ন ইন্সটিটিউটে যারা কাজ করছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে অনুনয় বিনয় করেছি, তারা বলেছে যে, মুখে বলতে পারি , কিন্তু লিখতে পারিনা। যদিও তাদের অনেকেই লেখা দিয়েছেন । এবং ভারতবর্ষের যে কোন পত্র পত্রিকার চেয়ে এই পত্রিকাটি একটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় দাঁড়িয়ে গেছে। আপনি আরেকটা যে প্রশ্ন রেখেছেন যে লিটিল ম্যাগাজিন একটি ছোট আন্দোলন এটা সত্যি। কিন্তু অন্য লিটিল ম্যাগাজিনগুলোর কথা বলতে পারি না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কিংবা রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক, জেলায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলিতে এই পত্রিকা রাখা হচ্ছে , ফলে বহু মানুষ এই পত্রিকা দেখছেন। কিছুদিন পর যখন আমি থাকবো না তখন এই যে একটা নতুন আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই আন্দোলনটা ইতিহাস হয়ে যাবে। যারা আমার পত্রিকা সঙ্গে যুক্ত নন জনে জনে এই পত্রিকাটি পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন গোলপার্ক বা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পত্রিকা নিচ্ছেন এবং তারা বলছেন পত্রিকাটি আসা মাত্র পাঠকরা পড়ছেন, নতুন কি লেখা আছে সে বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করতে পেরেছি।

গবেষক : যারা প্রতিস্পর্ধী তারা কিভাবে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হতে পারছে।

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ যারা দৃষ্টি বা বাক প্রতিস্পর্ধী তারা পত্রিকাটার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু যারা বৌধিক প্রতিস্পর্ধী তারা কিভাবে পত্রিকা পড়তে পারবে ?

গবেষক: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বা ইংরেজী বিভাগের এমন অনেক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে যারা প্রতিস্পর্ধী এবং যারা সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত, তাদের কি যুক্ত করার কোন প্রচেষ্টা রয়েছে ?

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের একজন আংশিক শ্রবণ এবং আংশিক দৃষ্টিহীন ছাত্র পরপর দুটি সংখ্যার জন্য ইংরেজি কবিতা লিখেছে। এ ছাড়া অন্য কোনোভাবে কাউকে পাইনি। আসলে এই প্রবন্ধগুলো উচ্চমানের তারা বলছেন যে দেশ বা সাপ্তাহিক বর্তমানে যে ধরনের প্রবন্ধ থাকে প্রতিস্পর্ধী পত্রিকাতেও সেই ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে কোনো কোনো প্রতিস্পর্ধী চরিত্রকে বলেছি যে তোমরা তোমাদের নিজেদের যন্ত্রণাগুলোকে তুলে ধরো। নিজেদের কষ্টের কথাগুলো লিখুন এবং তারা লিখছে।

গবেষক : **আমদের বাঙলা সাহিত্যে এমন অনেক সাহিত্য আছে যেগুলোর মধ্যে প্রতিবন্ধী চরিত্র রয়েছে। যদি আমাদের প্রথাগত পাঠক্রমে এই ধরণের সাহিত্য রাখা যায় তাহলে প্রতিবন্ধীদের প্রতি সহমর্মীতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে?**

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ : বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এই ধরণের চরিত্রের কথা আনেন রবীন্দ্রনাথ। সুভা দৃষ্টিহীন এই সব গল্পে তিনি এই ধরণের চরিত্রের কথা বলেন। 'লাইট হাউস স্কুল ফর দ ব্লাইন্ড' একেবারে প্রথম দিকে অন্যতম একজন ফাউন্ডার কালিদাস রায় তিনি নিজেও একজন দৃষ্টিহীন, রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে বলেছিলেন আপনি যে ক্যারেক্টারগুলো তৈরি করছেন তা কিন্তু বাস্তব চরিত্রদের থেকে অনেক দূরত্বের। এটা অনেক বেশি কল্পনাশ্রয়ী। এর চেয়ে আপনি এমন একটি উওন্যাস তৈরি করুন যেখানে প্রধান চরিত্র হবে প্রতিবন্ধী। আমি যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়েছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ করে যেতে পারেন নি। ফলে বাংলা সাহিত্যে মেজর জায়গায় এই ধরণের চরিত্রদের নিয়ে তাই তা সম্ভব হয়নি। তবে এ ব্যাপারে সরকারকে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এটা তো একটা ওয়েলফেয়ার, একে অস্বীকার করা যায় না। সে হিসেবে দেখতে আসা সম্ভব হয়নি। সিনেমায় এসেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে। কিন্তু সিনেমায় মানুষ যাচ্ছেন বিনোদনের জন্য। বিনোদন কে প্রধান জায়গায় রাখতে গিয়ে তারা ফিল্মে এই চরিত্রদের নিয়ে কাজ করাচ্ছেন। কিন্তু মানুষ সিনেমার মেসেজের দিকে খুব বেশি আগ্রহ দেখান না। বা বোঝেন না। এখন যদি টিভি প্রোগ্রামের মধ্যে যদি এগুলোকে রাখা যেত তাহলে হয়তো সম্ভব হত। আমি নিজে কোলকাতা দূরদর্শনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিই। আমি তাদের বলেছিলেম এই ধরণের কাজ ধারাবাহিক ভাবে করার জন্য। কিন্তু কলকাতা দূরদর্শন সাড়া দেননি। আমি মনে করি বিজ্ঞাপন সংস্থা এই বিষয়টি গ্রহণ করেননি গেলে এই ধরণের

পত্রিকাকে যেমন সরকারকে সাহায্য করতে হবে। আর কিছু নয়, যত সরকারি লাইব্রেরি আছে সে লাইব্রেরিগুলিতে এই ধরণের পত্রিকা রাখতে হবে। তাতেই মানুষকে অনেকটা সচেতন করা যাবে।

গবেষক : **অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে মূল্যবান সময় দেবার জন্য। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।**

ড. বিষ্ণুপদ নন্দ : আপনাকেও ধন্যবাদ।